Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

বাংলা

Subject Code 2 0 1 1 0 4

Marks Distribution

☐ **ইনকোর্স পরীক্ষা ও উপস্থিতি : মান– ২০**

ক. ইনকোর্স পরীক্ষা ১৫

খ. উপস্থিতি ৫

☐ **সমাপনী পরীক্ষা : মান– ৮০**

ব্যাকরণ : ৭টি প্রশ্ন হতে প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ৫ × ৪ = ২০

সাহিত্য :

ক. গদ্য : ৪টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ১০ × ২ = ২০

খ. পদ্য : ৪টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ১০ × ২ = ২০

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ৪টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ১০ × ২ = ২০

সর্বমোট = ১০০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** মানবণ্টনে ব্যাকরণ অংশ শুরুতে থাকলেও বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নে শেষে থাকে। সে অনুযায়ী সাজেশনের প্রশ্নধারা সাজানো হয়েছে।]

Exclusive Suggestions

ক বিভাগ

মান– ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-১ ও ২ : যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

সম্ভাবনার হার		
৯৯%	ক.	বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে পন্ডিতদের মতামত বিশ্লেষণ কর। অথবা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ সম্পর্কে পন্ডিতদের মতামত বিশ্লেষণ কর।
৯৯%	খ.	টীকা লেখ : (১) ইউসুফ-জোলেখা, (২) পদ্মাবতী (৩) বিদ্যাসুন্দর।
৯৯%	গ.	বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।
৯৯%	ঘ.	'নজরুল শুধু বিদ্রোহের নন, প্রেমেরও কবি'– এ কথার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

খ বিভাগ

মান– ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-৩ ও ৪ : যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

৯৯%	ক.	"আমাদের ভাষা সমস্যা" প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যুক্তিতর্কের মূল্যায়ন কর।
৯৯%	খ.	সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'পাদটীকা' গল্পে পন্ডিতমশাইয়ের চরিত্র অঙ্কন কর।
৯৯%	গ.	'পাদটীকা' গল্পে সৈয়দ মুজতবা আলী যে সত্য প্রকাশ করেছেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।
৯৯%	ঘ.	হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'তৈল' প্রবন্ধের নামকরণের সার্থকতা নিরূপণ কর।
৯৯%	ঙ.	'শিউলিমালা' গল্পে প্রেমের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ কর।
৯৯%	চ.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সমাপ্তি' গল্পের আলোকে মৃন্ময়ী চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

সম্ভাবনার হার		

গ বিভাগ

মান– ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-৫ ও ৬ : যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

৯৯%	ক.	'বলাকা' কবিতা যেন রবীন্দ্রনাথের স্থবিরতার বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ।– উক্তিটির যথার্থতার পরিচয় দাও।
৯৯%	খ.	'উমর ফারুক' কবিতা অবলম্বনে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর চারিত্রিক মাহাত্ম্যের পরিচয় দাও।
৯৯%	গ.	'উমর ফারুক' কবিতার মূল বক্তব্য আলোচনা কর।
৯৯%	ঘ.	'বনলতা সেন' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতিপ্রেমের যে মানসচিত্র অঙ্কন করেছেন, তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
৯৯%	ঙ.	'বনলতা সেন' কবিতার ভাব ও কাব্য সৌন্দর্য বিচার কর।
৯৯%	চ.	"আমার পূর্ব বাংলা' একটি অসামান্য আধুনিক কবিতা।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

ঘ বিভাগ

মান– ৫ × ৪ = ২০

প্রশ্নক্রম-৭ ও ৮ : যে-কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

৯৯%	ক.	ভাষা কাকে বলে? সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য লেখ।
৯৯%	খ.	বাংলা ভাষা কাকে বলে? সাধু ও চলিতরীতির পার্থক্য লেখ।
৯৯%	গ.	ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোনো পাঁচটি) : বই-পত্র, মনমাঝি, ঘরজামাই, উপজেলা, নদীমাতৃক, গৃহান্তর, গণতন্ত্র, অভাব, প্রতিদিন, দুধভাত, হাতেখড়ি, সপ্তাহ।
৯৯%	ঘ.	প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো পাঁচটি) : অত্যন্ত, উক্ত, একুশে, ক্রেতা, পার্থিব, খেলনা, কর্তব্য, ঢাকাই, দয়ালু, ডুবন্ত, কুলীন, অনুচর, চৌকিদার।
৯৯%	ঙ.	উপসর্গ কাকে বলে? বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
৯৯%	চ.	বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।
৯৯%	ছ.	বিভিন্ন বিরামচিহ্নের নাম লেখ এবং সংক্ষেপে এদের ব্যবহার রীতি উদাহরণসহ আলোচনা কর।
৯৯%	জ.	ভাব-সম্প্রসারণ লেখ : (ক) স্বদেশের উপকারে নাই যার মন কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন। (খ) 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'।
৯৯%	ঝ.	বাংলা প্রভাষক পদে চাকুরীর জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।
৯৯%	ঞ.	যৌন হয়রানি প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।

Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

বাংলা

Solution to Exclusive Suggestions

ক বিভাগ

মান– ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-১ ও ২ : যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

■ প্রশ্ন : ক ॥ বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে পন্ডিতদের মতামত বিশ্লেষণ কর।

অথবা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ সম্পর্কে পন্ডিতদের মতামত বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বেশ পুরনো। আর যুগবিভাজন ইতিহাস রচনার আবশ্যক অঙ্গ। কেননা সাহিত্যের বিস্তৃত সময় বা কালকে একত্রে আলোচনা করা কষ্টকর বিষয়। সংগতকারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে পন্ডিতগণ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে বিভিন্ন যুগে বিভাজন করেছেন এবং নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ

সাহিত্য বিশারদ ও গবেষকগণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে বিভক্ত করেছেন। যেমন– প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। সাধারণভাবে বৌদ্ধ-হিন্দু যুগকে প্রাচীন যুগ, পাঠান-মুঘল আমলকে মধ্যযুগ এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক-বিভাগোত্তর স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়কে আধুনিক যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে যুগের আরম্ভ এবং অভ্যন্তরীণ বিভাজন নিয়ে ভাষাপন্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। গবেষকগণ প্রধান যে যুগ বিভাগকে অকপটে মেনে নেন, তা হলো ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন যুগ, ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আধুনিক যুগ। কেউ কেউ ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেড়শো বছরকে অন্ধকার যুগ বলেছেন। যাহোক, বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিতগণের মতামত নিম্নরূপে আলোচনা করা যায়–

ক. পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন : প্রাচীন ও আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস রচনার গৌরব অর্জন করেন পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন। তিনি ১৮৭৩ সালে তাঁর 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে যুগ বিভাগ করেছেন। যেমন–

১. আদিকাল অর্থাৎ, প্রাকচৈতন্য পূর্ব। এ অংশে বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের সাহিত্য দৃশ্যমান হয়,
২. মধ্যযুগ অর্থাৎ, চৈতন্যযুগ থেকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে ধরা হয়,
৩. ইদানীন্তন কাল– ভারতচন্দ্র থেকে রামগতি ন্যায়রত্নের সময়কালীন কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্য ইদানীন্তন কালের।

খ. ড. দীনেশচন্দ্র সেন : তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ করেছেন এভাবে–

১. হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ (৮০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ), ২. গৌড়ীয় যুগ বা শ্রীচৈতন্যপূর্ব যুগ, ৩. শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ, ৪. সংস্কার যুগ এবং ৫. কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ বা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ।

গ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যে যুগ বিভাগ করেছেন তা ত্রুটিমুক্ত নয় বলে মনে করা হয়। কেননা মুসলমানপূর্ব যুগ কথাটির সঙ্গে তুর্কি বিজয়ের যুগ, প্রাকচৈতন্য বা চৈতন্যযুগ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নবাবি আমল বা ইংরেজ যুগও যুক্তিসংগত নয়। কারণ অন্যান্য শাসকের নামে অপরাপর অংশ চিহ্নিত হয়নি। তাছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্য যুগ নামে কোনো যুগ চিহ্নিত হলেও অন্যান্য সাহিত্যের পরিচয়সূচক যুগ চিহ্নিত হয়নি। যাহোক, তাঁর যুগ বিভাগ হলো–

১. প্রাচীন বা মুসলমানপূর্ব যুগ (৯৫০-১২০০ খ্রি.),
২. তুর্কি বিজয়ের যুগ (১২০০-১৩০০ খ্রি.),
৩. আদি মধ্যযুগ বা প্রাকচৈতন্য যুগ (১৩০০-১৫০০ খ্রি.),
৪. অন্ত মধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০ খ্রি.), চৈতন্য যুগ বা বৈষ্ণব সাহিত্যের যুগ (১৫০০-১৭০০ খ্রি.) ও নবাবি আমল (১৭০০-১৮০০ খ্রি.),
৫. আধুনিক যুগ (১৮০০ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত)।

ঘ. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : তিনি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগকে ভাগ করেছেন নিম্নলিখিতভাবে–

১. **প্রথম পর্ব :** প্রাকচৈতন্য যুগ – চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী,

২. **দ্বিতীয় পর্ব :** চৈতন্য যুগ – ষোড়শ শতাব্দী,

৩. **তৃতীয় পর্ব :** উত্তর চৈতন্য যুগ – সপ্তদশ শতাব্দী ও

৪. **চতুর্থ পর্ব :** অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

ঙ. গোপাল হালদার : গোপাল হালদার মধ্যযুগকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন তা হলো–

১. প্রাকচৈতন্য পর্ব– (১২০০–১৫০০),

২. চৈতন্য পর্ব– (১৫০০–১৭০০),

৩. নবাবি আমল– (১৭০০–১৮০০)।

চ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : ভাষাপণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগকে দুভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. পাঠান আমল (১২০১–১৫৭৬),

২. মোগল আমল (১৫৭৭–১৮০০)।

ছ. ড. মুহম্মদ এনামুল হক : ড. মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। যেমন–

১. তুর্কি যুগ (১২০০–১৩৫০),

২. সুলতানি যুগ (১৩৫১–১৫৭৫),

৩. মোগলাই যুগ (১৫৭৬–১৭৫৭)।

জ. ড. ওয়াকিল আহমদ : ড. ওয়াকিল আহমদ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের যুগ বিভাগ করেন নিম্নলিখিতভাবে–

১. উন্মেষের যুগ – নয়-এগারো শতক – আদি মধ্যযুগ,

২. শূন্যতার যুগ – বারো-চৌদ্দ শতক – মধ্য মধ্যযুগ,

৩. বিকাশের যুগ – পনেরো শতক – মধ্য মধ্যযুগ,

৪. সমৃদ্ধির যুগ – ষোলো-সতেরো শতক – মধ্য মধ্যযুগ,

৫. স্থিতিশীলতার যুগ – আঠারো শতক – অন্ত মধ্যযুগ (প্রথমার্ধ),

৬. অবক্ষয় যুগ – আঠারো শতক – অন্ত মধ্যযুগ (দ্বিতীয়ার্ধ)।

ঝ. ড. আহমদ শরীফ : ড. আহমদ শরীফ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে চারটি যুগে ভাগ করেছেন। যেমন–

১. মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন শাসনকাল– প্রাচীনযুগ,

২. তুর্কি-আফগান-মোগল শাসনকাল– মধ্যযুগ,
   ক. আদি মধ্যযুগ– তেরো-চৌদ্দ শতক,
   খ. মধ্যযুগ– পনেরো-আঠারো শতক,

৩. ব্রিটিশ শাসনকাল– আধুনিক যুগ,

৪. স্বাধীনতা উত্তরকাল– বর্তমান যুগ।

মূলত ড. আহমদ শরীফ যুগ বিভাগ করেছেন রাজ্য-রাজত্ব পরিবর্তন হওয়ার কারণে এবং এর ফলে মানুষ ও ব্যাবহারিক জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে তার প্রেক্ষিতে। বাংলা সাহিত্যের রীতির ওপর ভিত্তি করে তিনি আবার মধ্যযুগকে পৃথকভাবে পাঁচটি যুগে ভাগ করেন। যেমন–

প্রথম যুগ : ১৩-১৪ শতক– দৃশ্যমান বা লোকায়ত সাহিত্যের কথকতার যুগ।

দ্বিতীয় যুগ : ১৫ শতক – লিখিত লৌকিক দেবদেবী নির্ভর সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের যুগ।

তৃতীয় যুগ : ১৬ শতক – ভাববিপ্লব বা রেনেসাঁর যুগ বা চৈতন্য যুগ।

চতুর্থ যুগ : ১৭ শতক – লোকায়ত-পীর-দেবতাদের যুগ।

পঞ্চম যুগ : ১৮ শতক – অবক্ষয়ের যুগ তথা যুগসন্ধিক্ষণের যুগ।

ঞ. আধুনিক যুগে উপবিভাগ থাকলেও বিশেষ মতবিরোধ নেই। ড. সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক এবং বস্তুগতভাবে বর্ণনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের তিন যুগের বৈশিষ্ট্য বহিরাগত শক্তির দ্বারা তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যেমন–

ক. আদি পর্যায় : প্রাক-তুর্কি আগমন– ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত,

খ. মধ্য পর্যায় : তুর্কি আগমন পরবর্তী কাল– ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত,

গ. আধুনিক পর্যায় : ইউরোপ প্রভাবিত কাল– ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পরবর্তী কাল।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগকে আবার ১৮০১ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত প্রথম পর্যায় এবং ১৮৬১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায় ধরা হয়। তবে বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ জাতিগত, ধর্মীয় বা শাসক সম্পর্কীয় হওয়া সমীচীন নয়। তাই কালগত ও বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক– এ তিন ভাগে ভাগ করাই যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য। যেমন–

১. প্রাচীন যুগ (৬৫০–১২০০ খ্রি.);
২. মধ্যযুগ (১২০১– ১৮০০ খ্রি.);
   ক. আদি মধ্যযুগ (১২০১– ১৫০০ খ্রি.), খ. অন্ত মধ্যযুগ (১৫০১– ১৮০০ খ্রি.)।
৩. আধুনিক যুগ (১৮০১– বর্তমানকাল পর্যন্ত);
   ক. প্রথম পর্যায় (১৮০১– ১৮৬০ খ্রি.), খ. দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৬১– বর্তমানকাল পর্যন্ত)।

এছাড়া আধুনিক যুগকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। যথা–

i. প্রথম পর্ব (১৮৬১– ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ, দেশবিভাগের পূর্বকাল),
ii. দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৮– ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ, দেশবিভাগের পূর্বকাল),
iii. তৃতীয় পর্ব (১৯৭২– স্বাধীনতা-উত্তরকাল)।

উপসংহার : বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ নিয়ে নানা অভিমত পরিলক্ষিত হয়। তবে সাহিত্যের যুগ বিভাগকে সর্বজনগ্রাহ্য তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। আবার মধ্যযুগটি বিশাল পরিসরের হওয়ায় পঠনপাঠনের সুবিধার্থে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এরপর আধুনিক যুগকে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাগ করা হয়। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়কে আবার ৩টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এভাবে বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ করা হয়েছে।

■ প্রশ্ন : খ ॥ টীকা লেখ : (১) ইউসুফ-জোলেখা, (২) পদ্মাবতী, (৩) বিদ্যাসুন্দর।

উত্তর ।। (১) ইউসুফ-জোলেখা,

'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের আরম্ভে আল্লাহ ও রাসুলের বন্দনা, মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রশংসা এবং রাজবন্দনা স্থান পেয়েছে। তৈমুর বাদশার কন্যা জোলেখা আজিজ মিশরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও ক্রীতদাস ইউসুফের প্রতি গভীরভাবে প্রেমাসক্ত হন। নানাভাবে আকৃষ্ট করেও তিনি ইউসুফকে বশীভূত করতে পারেননি। বহু ঘটনার পরিবর্তনে ইউসুফ মিশরের অধিপতি হন। ঘটনাক্রমে জোলেখা তখনও তার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে পারেননি এবং পরে ইউসুফের মনেরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে তাদের মিলন হয়। এই প্রধান কাহিনির সঙ্গে আরও অসংখ্য কাহিনি ঐ কাব্যে স্থান পেয়েছে।

শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে দেশি ভাষায় ধর্মীয় উপাখ্যান বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। কবি প্রেমরসে ধর্মবাণী প্রচার করতে চাইলেও তা মানবীয় প্রেমকাহিনি হিসেবেই রূপলাভ করেছে। ইরানের সুফি কবিরা ইউসুফ-জোলেখার প্রেমকাহিনিতে যে রূপক উপলব্ধি করেছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর তাকেই কাব্যের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, ইউসুফ-জোলেখা ভাবুক-ভাবিনী অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মা। প্রেমের মাধ্যমে উভয়ের মিলন সম্ভব। কবি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মানবিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবেই কাব্যটি গ্রহণযোগ্য। জোলেখার মনে প্রেমের প্রভাবে যে চৈতন্য জাগে তাতে আবাল্যের আরাধ্যা দেবীমূর্তি ভেঙে ফেলে প্রেমাস্পদের ধর্মে দীক্ষালাভ ঘটে। জোলেখার এ মনোযোগ ব্যক্ত করে কবি লিখেছেন–

পাষাণ ভাঙ্গিয়া আজি করিমু চৌখণ্ড,
ব্যর্থ সেবা কৈলু তোক জানিলুঁ তু ভণ্ড।
প্রতিমাক পাছাড়িয়া কৈল খণ্ড খণ্ড,
ভূমিতলে খেপি তাক কৈল লণ্ডভণ্ড।
কান্দিয়া পশ্চিম দিকে করিলেন্ত মুখ,
পরম ঈশ্বর সেবা করেন্ত মনসুখ।

ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেছেন, 'অবলীলাক্রমে গল্প লিখতে পেরেছেন–এটাই সগীরের কৃতিত্ব। গল্পের ঘনঘটায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা রোমান্টিক কবিদের লক্ষ্য ছিল। দর্শনচিন্তা, তত্ত্বচিন্তা অথবা চরিত্র চিত্রণের প্রতি তাঁরা জোর নজর দেননি। সরস গল্প সৃষ্টি করে নিছক আনন্দের ভোজে পাঠকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সগীরের কলম সে পথ বেছে নিয়েছে। গল্প রচনা কবির লক্ষ্য বলে ঘটনার গ্রহণ-বর্জনের কোনো হিসাব করেননি।'

কবি কাব্যের রূপায়ণে ফারসি উৎসের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য দেখাননি বলে কাব্যে কবিপ্রতিভার মৌলিকতার নিদর্শন বিদ্যমান। ফেরদৌসীর কাব্যের ঘটনার সঙ্গে সগীরের অনৈক্য অনেক স্থানেই রয়েছে। বিশেষত ইবন আমিন ও বিধুপ্রভার প্রণয় এবং পরিণয় কাহিনি শাহ মুহম্মদ সগীরের নিজস্ব কল্পনা। ড. মুহম্মদ এনামুল হক এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'কাব্যটিতে কোনো বিদেশি আবহ নাই বলিলেও চলে। বাংলার পরিবেশ এই কাব্যে রক্তমাংস ও বাংলার আবহ এর প্রাণ বলিয়া কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে মনেই হয় না যে, ইহা কোনো বিদেশীয় পুস্তকের অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ।' শাহ মুহম্মদ সগীর ব্যতীত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের অন্যান্য রচয়িতা হচ্ছেন আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, গোলাম সফাতউল্লাহ, সাদেক আলী ও ফকির মুহাম্মদ।

উত্তর ।। (২) পদ্মাবতী

'পদ্মাবতী' কবি আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য। কাব্যটি প্রখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। অযোধ্যার কবি জায়সী ১৫৪০ সালে 'পদুমাবৎ' কাব্য রচনা করেছিলেন। আলাওল ১৬৫১ সালে আরাকানরাজ সাদ উমাদার বা থদোমিন্তারের আমলে (১৬৪৫-৫২) মাগন ঠাকুরের আদেশে 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। 'পদ্মাবতী' হিন্দি পদুমাবতের স্বাধীন অনুবাদ। কাহিনি রূপায়ণ, চরিত্র চিত্রণ, প্রকাশভঙ্গি প্রয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আলাওলের স্থান সর্বোচ্চে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 'স্থানে স্থানে প্রকাশিলুঁ নিজ মন উক্তি।' একটি অধ্যাত্মরসের কাব্যকে মানবরসের কাব্যে রূপান্তরিত করতে গিয়ে কবি আলাওল আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

'পদ্মাবতী' প্রেমমূলক ঐতিহাসিক কাব্য। তবে প্রেমের স্বরূপই এখানে বেশি, ইতিহাস এখানে গৌণ। পদ্মাবতী চিতোরের রানি পদ্মিনীর কাহিনি নিয়ে রচিত। পদ্মাবতীর স্বামীর নাম রত্নসেন। পদ্মাবতী অপূর্ব সুন্দরী। চিতোরের রাজসভায় রাঘবচেতন নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দীনের নিকট পদ্মাবতীর অনুপম রূপের প্রশংসা করে তাঁকে হরণ করতে প্ররোচিত করেন। আলাউদ্দীন রত্নসেনের নিকট পদ্মাবতী সম্বন্ধে অনুরূপ প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে চিতোর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রত্নসেন বন্দি হলেও বিশ্বস্ত অনুচরদের সহায়তায় মুক্তি পেতে সক্ষম হন। পরে রাজা দেওপালের সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধ বাঁধে। সে যুদ্ধে দেওপাল নিহত এবং রত্নসেন আহত হন। এ সুযোগে আলাউদ্দীন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করেন।

'পদ্মাবতী' রচনায় আলাওল জায়সীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলেও বর্ণনা পদ্ধতির বিশিষ্টতা এবং বিশেষ বিশেষ সংযোজনের মাধ্যমে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'বাস্তবিক তাঁহার সমান নানা বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সে যুগে আর কেহই ছিলেন না।' 'পদ্মাবতী' কাব্যের সর্বত্র এই পাণ্ডিত্যের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষণীয়। কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে জায়সীর উত্তরাধিকার নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলাওলের নিজস্ব জ্ঞানভান্ডারের পরিচায়ক। বিশেষত ছন্দশাস্ত্র, অষ্টনায়িকাভেদশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, সংগীতশাস্ত্র, অশ্বচালনাবিদ্যা, চৌগানখেলা, বিবাহাচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে আলাওল মৌলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর যে মন্তব্য তাতেই তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটেছে।

উত্তর ।। (৩) বিদ্যাসুন্দর

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের কাহিনি সুপ্রাচীন। এই কাব্য রচনায় কবি সাবিরিদ খান প্রচলিত কাহিনি অবলম্বন করেছেন। এই কাব্যের কাহিনি কালিকামঙ্গালের অন্তর্গত এবং ভারতচন্দ্রসহ অনেক কবি একই কাহিনিভিত্তিক কাব্যের রূপ দিয়েছেন। সাবিরিদ খানের কাব্যের কাহিনির সঙ্গে কালিকার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। কাব্যরস সৃষ্টি ব্যতীত এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না; মানবীয় রস এতে প্রাধান্য পেয়েছে। কবি রোমান্স হিসেবেই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কবি তাঁর কাব্যকে নাটগীতি বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রণয় কাহিনির প্রথম রূপ দেন সংস্কৃত কবি বিলহন 'চৌপঞ্চাশিকা' কাব্যে। সাবিরিদ খান রোমান্টিক কাব্যের আখ্যানবস্তু হিসেবে একে গ্রহণ করতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষার কোনো কাব্যের অনুসরণ করেছেন। বিদ্যাসুন্দরের অন্যান্য কবি কালিকামঙ্গালের বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করেননি। তাই রোমান্টিক কাব্যের ধারায় কেবল সাবিরিদ খানকেই গ্রহণ করা চলে। ড. আহমদ শরীফ সাবিরিদ খানের প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "ভাষা ও উপমা-অলংকারের সংযত ব্যবহারের আর পদলালিত্যে ও ছন্দসৌন্দর্যে গোটা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দরের দ্বিতীয় জুড়ি নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কাব্য পদলালিত্য এবং ছন্দগৌরব সত্ত্বেও অনেক সময় অতিকথনের দোষে আমাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। কিন্তু সাবিরিদ খানের অনন্যসাধারণ ললিত-মধুর রচনা পাঠক মাত্রকেই চমৎকৃত ও বিস্ময়াভিভূত করবে।"

■ প্রশ্ন : গ ॥ বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্মেষ, প্রকাশ, বিকাশ ও প্রচারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান অপরিসীম। এ কলেজ থেকেই বাংলা গদ্যের প্রাথমিক নিদর্শন শুরু হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কলকাতায় লালবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ঠা মে কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস হলেও ২৪শে নভেম্বর থেকে কলেজের কাজ শুরু হয়েছিল। উইলিয়াম কেরী ছিলেন এ কলেজের কর্ণধার। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগ চালু হলে তিনি বিভাগীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ৫৪ বছর স্থায়ীকালের শেষের দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তবে গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ হিসেবে ১৮০১–১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ধরা হয়।

পটভূমি : লর্ডওয়েলেসলি ছিলেন তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, কোম্পানির দায়িত্বপূর্ণ ভার নিয়ে বিলেত থেকে যেসব সিভিলিয়ান কর্মচারী আসে, তাঁরা অধিকাংশ চৌদ্দ থেকে আঠারো বছরের নাবালক, স্বদেশে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি, এদেশেও তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই দেশীয় বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিয়ে এ সকল সিভিলিয়ানদের উপযুক্ত করে তোলার জন্যই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে এ কলেজে বাংলা বিভাগ প্রবর্তিত হলে অধ্যক্ষ হিসেবে আসেন শ্রীরামপুরের পাদ্রি ও বাইবেলের অনুবাদক বাংলায় অভিজ্ঞ উইলিয়াম কেরি। তিনি তাঁর অধীন দুইজন পণ্ডিত ও আরও ছয় জন সহযোগী পণ্ডিতদের সহযোগিতায় বাংলা গদ্য কলেজের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলাফল দিয়েই বাংলা গদ্যের অনুশীলনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা নিরূপণ করা হয়। ওয়েলেসলি কিছু বিলাতী সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা, এদেশীয় সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান প্রদানের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বে ১৮০১–১৮১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ৮ জন লেখক মোট ১৩টি বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন।

বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান/ভূমিকা : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কয়েকজন কৃতি ব্যক্তিত্ব যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম কেরি, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উল্লেখযোগ্য। এঁদের মেধা ও মনন বাংলা গদ্যের সূচনা ও বিকাশের পথকে সুগম করে। নিচে কতিপয় লেখকের নাম, তাঁদের রচিত পুস্তকের নাম এবং তাঁদের অবদান/ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. উইলিয়াম কেরি : কথোপকথন (১৮০১), ইতিহাসমালা (১৮১২)।
২. রামরাম বসু : রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), লিপিমালা (১৮০২)।
৩. গোলোকনাথ শর্মা : হিতোপদেশ (১৮০২)।
৪. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার : বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), রাজাবলি (১৮০৮), প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮০৩)।
৫. তারিণীচরণ মিত্র : ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩)।
৬. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র (১৮০৫)।
৭. চণ্ডীচরণ মুন্সী : তোতা ইতিহাস (১৮০৫)।
৮. হরপ্রসাদ রায় : পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)।

উইলিয়াম কেরি : উইলিয়াম কেরি ভারতের বহু ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেরি কেবল বাংলা বিভাগ পরিচালনা করেননি, তিনি নিজেই নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখেছেন। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ হলো 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা'। 'কথোপকথন' প্রকাশিত হয় ১৮০১ সালে। বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণির লোকের মুখের ভাষার একত্রীকরণের ফসল 'কথোপকথন'। অবশ্য গ্রন্থটি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কেরির রচনা কিনা তা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতেন। তবে কেরির নামে প্রকাশিত বলে এর সকল কৃতিত্ব কেরিরই প্রাপ্য। 'কথোপকথন' গ্রন্থটি ছিল দ্বিভাষিক, এক পৃষ্ঠায় বাংলা, অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি। উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় দেড়শত ইতিহাস আশ্রিত গল্পের সমন্বয়ে 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ সালে মুদ্রিত হয়। কেরি পরিচ্ছন্ন ভাষাতে গল্পগুলোকে সরল ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেন। গদ্য সাহিত্যের উদ্ভবে বা উত্তরণে 'ইতিহাসমালা'র অবদান উল্লেখযোগ্য।

রামরাম বসু : রামরাম বসু ছিলেন উইলিয়াম কেরির সহযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনাকারীদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি সাহিত্যিক, যার লিখিত বাংলা গদ্য সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। বাংলা গদ্যের পুরোভাগে তার অবস্থানের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। কেরির অনুরোধে তিনি ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সহকারী পণ্ডিতরূপে যোগদান করেন। তিনি দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। একটি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং অন্যটি হলো 'লিপিমালা'। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ফারসি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে রচিত হলেও বাংলা গদ্যে মৌলিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস এই বইটি। ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পায় 'লিপিমালা'। এটা রামরাম বসুর একটি ভিন্নধর্মী কাল্পনিক পত্রগুচ্ছের সমষ্টি। পত্রাকারে লিখিত কতকগুলো পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় বিষয় আছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থে প্রথম বইয়ের মতো ফারসি শব্দের প্রতুলতা নেই; বরং এর রচনারীতি সহজ-সরল ও মৌখিক রীতির কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তৎকালীন প্রচলিত গদ্যরীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামরাম বসু রচিত গদ্যগ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের গদ্যসাহিত্য প্রচলনের উদ্দেশ্যকে অনেকাংশে সফল ও সার্থক করেছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার : উইলিয়াম কেরির অধীন প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার শুধু অধ্যাপক পণ্ডিতই ছিলেন না, তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও সে আমলে প্রবাদের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অধিক খ্যাতিসম্পন্ন। তিনি ছিলেন আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ভাষার বিদগ্ধ পণ্ডিত। মার্শম্যানের মতো মিশনারি দল তাঁর কাছে বসে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে মার্শম্যান তাঁকে ডক্টর জনসনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৮০১ থেকে ১৮১৬ পর্যন্ত এ কলেজে চাকরিরত ছিলেন এবং অধ্যাপনাকালে তিনি পাঁচটি বাংলা বই লিখেন। বইগুলো হলো 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), রাজাবলি (১৮০৮), হিতোপদেশ (১৮০৮), 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩)। তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে অনুবাদ ও নিজস্ব সৃষ্টি গ্রন্থ আছে। তিনি অনুবাদগুলোতে সংস্কৃত অনুসারী ও চলিতভাষা এ দুই রীতি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর লেখায় সতেজ প্রকাশভঙ্গি এবং সরল শব্দবিন্যাস বাংলা গদ্য প্রসারের পথকে সুগম করেছিল। বাংলা গদ্যের ভাষাকে উদ্দেশ্যানুগ ও বিষয়োচিত করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

গোলোকনাথ শর্মা : গোলোকনাথ শর্মা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক না হয়েও মিশনারিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর রচিত 'হিতোপদেশ' ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বইটি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ হলেও কথ্যরীতির অনুসরণে গদ্যের প্রাঞ্জলতা সঞ্চারিত হয়েছে।

চণ্ডীচরণ মুন্সী : চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি বইটি ফারসি হতে অনুবাদ করেন। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত এ গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় : রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র' ১৮০৫ সালে রচিত। এ গ্রন্থে ইতিহাসের বিষয়বস্তু স্থান পেলেও কাহিনির ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য। গ্রন্থটি বর্ণনামূলক সাধুভাষায় লেখা। বাক্য সরল ও সংক্ষিপ্ত।

তারিণীচরণ মিত্র : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দুস্থানি বিভাগের দ্বিতীয় মুনশী তারিণীচরণ মিত্র ইংরেজি থেকে 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' বাংলায় অনুবাদ করেন। 'নীতিকথা' নামক অন্য একটি অনুবাদ গ্রন্থেও তাঁর নাম রয়েছে। সংগতকারণেই বলা যায়, তিনি বাংলা গদ্যের বিকাশে ভূমিকা রাখেন।

হরপ্রসাদ রায় : হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫) সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা। গ্রন্থের রচনারীতি সরল ও প্রাসাদগুণ বিশিষ্ট। শিক্ষাপ্রদ উপদেশাত্মক গল্প ছাড়া এই গ্রন্থের তেমন কোনো নতুনত্ব নেই।

উপসংহার : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রাখলেও প্রথম পনেরো বছর শেষে বাংলা গদ্যের উপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তথা ইংরেজ মিশনারিদের প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে। শুধু পাঠ্যপুস্তক রচনাতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তবুও বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ হিসেবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা কোনো মহৎ ও স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম না হলেও বাংলা গদ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

■ প্রশ্ন : ঘ ॥ 'নজরুল শুধু বিদ্রোহের নন, প্রেমেরও কবি'– এ কথার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : কাজী নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি হিসেবে আখ্যায়িত করলেও গান ও কবিতায় তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় মেলে। তিনি সাম্যবাদী, অসাম্প্রদায়িক কবি, একইসঙ্গে বিদ্রোহী ও প্রেমিক কবি, গীতিকার, সংগীতজ্ঞ। তিনি তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় বলেছেন, "মম এক হাতে-বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য..... মোর প্রিয়া হবে এসো রানি–" এসব কথা থেকে উপলব্ধি করা যায় তিনি একাধারে রণতূর্য বাদক আর অন্যদিকে প্রেমের কবি হিসেবেও সমধিক পরিচিত।

কবি নজরুলের গানে প্রেম : কবি নজরুলের বিভিন্ন গানে তাঁর প্রেমিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেম-বিরহ, ব্যর্থতা, আশা-নিরাশার অনুভূতি প্রকাশে নজরুলের গানগুলো ছিল অদ্বিতীয়। তাঁর প্রেম-সংগীতগুলোর বাণী ও সুর এককথায় অনবদ্য। নজরুল নানা আঙ্গিকের তিন হাজারেরও বেশি গান রচনা করেছেন। পৃথিবীর কোনো ভাষায় একক হাতে এত বেশিসংখ্যক গান রচনার উদাহরণ নেই, আরও বড় কথা তাঁর নিজের লেখা অনেক গান তাঁরই সুরারোপিত। তাঁর গানগুলো নজরুল গীতি নামে পরিচিত। নজরুলের লেখা প্রেম ভালোবাসার আঙ্গিকের গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় তিনি কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই আঙ্গিকের জনপ্রিয় গানগুলো লিখেছিলেন। তাঁর লেখা প্রেমের গানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. আজ নিশীথে অভিসার তোমার পথে।
২. আমি সুন্দর নহি, জানি হে বন্ধু জানি।
৩. আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন।
৪. আমি ময়নামতির শাড়ি দেবো।
৫. আঁখি তোলো দানো করুণা।
৬. ওরে নাইয়া ধীরে চালাও তরণী।
৭. কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল।
৮. গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়।
৯. গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে পরো পরো চৈতালী-সাঁঝে কুসমী শাড়ি।
১০. তব যাবার বেলা বলে যাও মনের কথা।
১১. তোমার হাতের সোনার রাখি আমার হাতে পরালে।
১২. নিশি না পোহাতে যেয়ো না যেয়ো না।
১৩. প্রিয় যাই যাই বলো না–
১৪. প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথাই।
১৫. পেয়ে আমি হারিয়েছি গো।
১৬. পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে।
১৭. বল সখি বল ওরে সরে যেতে বল।
১৮. বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে।
১৯. বুকে তোমায় যৌবন-সিন্ধু টলমল টলমল।
২০. ভালোবাসার ছলে আমায়।
২১. ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি।
২২. মোর প্রিয়া হবে এসো রানি, দেব খোঁপায় তারার ফুল–
২৩. মিলন-রাতের মালা হব তোমার অলকে।
২৪. মোরা আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম।
২৫. যাবার বেলায় ফেলে যেয়ো একটি খোঁপার ফুল।
২৬. যবে সন্ধ্যা–বেলায় প্রিয় তুলসী-তলায়।
২৭. যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই।
২৮. সখি বাঁধো লো বাঁধো লো ঝুলনিয়া।

কবি নজরুলের উল্লিখিত গানগুলো ছাড়াও আরও অনেক বিখ্যাত প্রেমের গান রয়েছে। নজরুলের জীবনে দ্রোহ ছিল, ছিল প্রেম। নজরুলের কবিতায় প্রেমের অনুষঙ্গ বিশেষভাবে ধরা দিয়েছে। তাঁর প্রেমের কবিতায় নারী অনুষঙ্গ উঠে এসেছে। তিনি নারীকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন তাঁর কবিতা ও গানে। যেমন– 'নারী' কবিতায় তিনি বলেছেন,

সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

কবি নজরুলের কবিতায় প্রেম

নজরুলের কবিতায় নারীর সৌন্দর্য, নারীর প্রতি প্রেম, নারীর মর্যাদা ইত্যাদি নানা দিক বিধৃত হয়েছে। তিনি শুধু দ্রোহের কবিতা লিখেননি; অসংখ্য প্রেমের কবিতাও লিখেছেন। তাঁর প্রেমের কবিতা থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. প্রেম, রোমান্টিকতা 'ছায়ানট' কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই কাজের অন্তর্গত 'চৈতী হাওয়া' কবিতায় কবির প্রেম-বিরহ প্রকাশ পেয়েছে এভাবে–

হারিয়ে গেছে অন্ধকারে পাইনি খুঁজে আর,
আজকে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার।

২. 'রানি' কবিতায় কবি নজরুল লিখেছেন–

তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি,
আমার এ রূপ- সে যে তোমায় ভালোবাসার ছবি।
আপন জেনে হাত বাড়ালো–
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায়-বেলার সন্ধ্যা-তারা
পুবের অরুণ রবি,
তুমি ভালোবাসো বলে ভালোবাসে সবি।

৩. কবি নজরুল তাঁর 'গোপন প্রিয়' কবিতায় লিখেছেন–

পাইনি বলে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রানি,
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার করছি কানাকানি।
আমি এ-পার, তুমি ও-পার,
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার
ও-পার হতে ছায়া-তরু দাও তুমি হাতছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁয়াখানি।

৪. প্রেম হলো 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যের মূল সুর। এই কাব্যের প্রেম নজরুলের জীবন বন্দনার নবরূপায়ণ। নজরুলের চিন্তায় নারী হলো প্রেরণার উৎস। 'বধূবরণ' কবিতায় নারীর স্পর্শে জগৎরাঙা হয়ে ওঠে এভাবে–

বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব,
রাঙা মন রাঙা আভরণ,
বলো নারী– এই রক্ত-আলোকে
আজ মম নব জাগরণ।

৫. নজরুল ইসলাম তাঁর 'অনামিকা' কবিতায় তাঁর অনাগত প্রিয়াকে এভাবে বন্দনা করেছেন–

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন-সহচরী
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!
তোমারে বন্দনা করি,
হে আমার মানস-রঞ্জিনী,
অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী!

৬. কাজী নজরুল ইসলামের 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থের 'পূজারিণী' কবিতায় ভালোবাসার অনুরণন ঘটিয়েছেন এক বিশেষ অনুষঙ্গে। যেমন–

এত দিনে অবেলায়
প্রিয়তম।
ধূলি-অন্ধ ঘূর্ণি সম
দিবাযামী
যবে আমি
নেচে ফিরি রুধিরাক্ত মরণ-খেলায়
এ দিনে অ-বেলায়
জানিলাম, আমি তোমা জন্মে জন্মে চিনি।

এভাবে নানা সংগীতে কবি নজরুলের প্রেম-বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি নানা আঙ্গিকের গান বিশেষ করে প্রেম পর্যায়ের গানগুলো তাঁর নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিরহ-বেদনার ফসল। একজন সত্যিকারের প্রেমিক বলতে যা বোঝায়, তা নজরুলের ব্যক্তিজীবন থেকেই উৎসারিত। নজরুলের জীবনে কয়েকজন নারী বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। তাদের সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠলেও সেসব প্রেম ভালোবাসা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি। আর তা থেকেই প্রেম ভালোবাসার কবিতা ও গানে আনন্দ, বিরহ বেদনার অনুরণন ঘটিয়েছেন নজরুল। তারই প্রকৃত উদাহরণ প্রেম বিরহের আলোচ্য গান ও কবিতাগুলো।

বিদ্রোহী কবি হিসেবে নজরুল : কবি নজরুল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বিদ্রোহী কবি হিসেবেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। 'অগ্নিবীণা'র শ্রেষ্ঠ কবিতা হলো 'বিদ্রোহী'। এই কবিতার নামানুসারে নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। এখানে তিনি ঘোষণা করেছেন–

আমি চিরবিদ্রোহী বীর
আমি বিশ্ব ছাড়িয়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।

নজরুল প্রচলিত ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, শোষক ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ছিল। সমাজের সমস্ত রকম কুসংস্কার ও অনিয়মের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ভাব ফুটে উঠেছে বিভিন্ন কবিতায়।

উপসংহার : নজরুল বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর জীবনে যে প্রেম ছিল তা যথার্থই বলা যায়, নজরুলের প্রেম পর্যায়ের বিভিন্ন গান ও কবিতা চিরকালীন অনুষঙ্গে ভাস্বর। প্রেমিক কবি নজরুলের গান ও কবিতা আজকের প্রেমিক-প্রেমিকাদের হৃদয়তন্ত্রীকে প্রেম-ভালোবাসা এবং বিরহ-বেদনায় অনুরণন ঘটায়। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলামের গান ও কবিতায় প্রেম-ভালোবাসা উজ্জ্বল মহিমায় দীপ্যমান।

খ বিভাগ

মান– ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-৩ ও ৪ : যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

■ প্রশ্ন : ক ॥ "আমাদের ভাষা সমস্যা" প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যুক্তিতর্কের মূল্যায়ন কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'আমাদের ভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে লেখক আমাদের ভাষা কী বা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং এক সুন্দর দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিদ্যা অর্জন করা সহজ; তবে তিনি বিদেশি ভাষার বিপক্ষে নন। এটাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রধান ভাষা মাতৃভাষাকেই আঁকড়ে ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করা উচিত।

আমাদের ভাষা যে রকম হওয়া উচিত : 'আমাদের ভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে লেখক এক সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করেছেন। আমাদের ভাষা কী রকম হওয়া উচিত-যুক্তিতর্ক দিয়ে তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নিজ ভাষা-চিন্তা প্রয়োগ করে সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছেন, নিচে তা উপস্থাপন করা হলো :

আমাদের ভাষার বৈশিষ্ট্য : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, মাতৃভাষাই আমাদের প্রধান ভাষা। অর্থাৎ বাংলাই হবে আমাদের বলার, পড়ার এবং লেখার ভাষা। ধর্মীয় গ্রন্থ অনুবাদ হবে মাতৃভাষা বাংলায়। দেশি ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রচলন হবে। লেখক তাঁর মতের সমর্থনে এ ধরনের কিছু জোড়ালো যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যেমন– তিনি বলেছেন, 'আমাদের কথাবার্তার, ভয়-ভালোবাসার, চিন্তা-কল্পনার ভাষা বাংলা।' সময়ের আবর্তনে তাঁর এ ধরনের নানা যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে।

ভাব বিনিময়ে মাতৃভাষা : মানুষ নানাভাবে বিভিন্ন ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু লেখকের মতে, মাতৃভাষায় ভাব বিনিময় মর্মকে যেভাবে স্পর্শ করে অন্য কোনো ভাষায় সেভাবে স্পর্শ করে না। মাতৃভাষা পরম প্রশান্তির ভাষা। যখন একজন মানুষ নিজ ভাষাভাষীর মানুষ থেকে দূরে থাকে তখন মাতৃভাষার মধুর তানের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মাতৃভাষার বিশাল শূন্যতা তাকে গ্রাস করে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, মাতৃভাষায় কোনো বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যতটা সহজ, অন্য ভাষায় ঠিক ততটাই কঠিন। তাই শিক্ষার বাহন হতে হবে মাতৃভাষা। প্রাবন্ধিক আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, "সেদিন অতি নিকটে যে দিন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান ভাষার স্থান অধিকার করিবে।" তিনি আরও বলেছেন, "বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মতন সৃষ্টিছাড়া প্রথা কখনও টিকিতে পারে না।"

মৌলবি-মৌলানাদের বিরূপ মন্তব্যের খণ্ডন : কতিপয় মৌলবি-মৌলানা বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, তাঁরা এ ভাষাকে কাফেরি ভাষা বলে ধিক্কার দেন। তাঁরা এ ভাষায় সাহিত্য রচনাকে অমর্যাদাকর বলে মনে করেন। কিন্তু প্রাবন্ধিক এ বিষয়ে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, 'যে পর্যন্ত আরবি-ফারসি জানা মুসলমান লেখক বাংলা ভাষার সেবায় কলম না ধরিবেন, সে পর্যন্ত কিছুতেই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য গঠিত হইবে না।"

উন্নতির সোপান মাতৃভাষা : মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যতদিন না অবাধ হবে ততদিন জাতি প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকবে। এজন্য মাতৃভাষার উন্নতি ছাড়া কোনো জাতি কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ওয়াইক্লিফ ল্যাটিন থেকে ইংরেজি ভাষায় বাইবেল অনুবাদের পর থেকে ইংরেজ জাতির উন্নতির অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। জার্মানিতে যতদিন জার্মান ভাষা অসভ্য বলে পরিগণিত ছিল ততদিন পর্যন্ত জার্মানির জাতীয় জীবনের বিকাশ হয়নি।

ধর্ম প্রচার-প্রসারের পূর্বশর্ত মাতৃভাষা : ধর্মচর্চা ও প্রচার-প্রসারে যে-কোনো মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা মাতৃভাষায় ধর্মচর্চা ও গবেষণা ব্যতীত কোনো ধর্ম বিকাশ লাভ করতে পারে না। কোনো জনগোষ্ঠীর মাঝে ধর্ম প্রচার করতে চাইলে সেই জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার মাধ্যমেই করতে হবে, অন্যথায় ধর্মের মর্মবাণী তাদের মর্ম স্পর্শ করবে না। মুসলমানের ধর্ম দেশগত বা জাতিগত কোনো ধর্ম নয়, তা সর্বজনীন ধর্ম। কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীকেও মাতৃভাষায় ধর্মচর্চা করতে হবে। তা না হলে ধর্মান্ধতা প্রকট আকার ধারণ করবে।

সাহিত্যের ভাষা : মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা ছাড়া সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য অর্জন করা অনেকাংশেই অসম্ভব। কেননা এটা পাঠকের হৃদয়কে আলোড়িত করে। বিভাষায় সাহিত্যচর্চা করা হলে সে সাহিত্য লেখক ও পাঠক উভয়কেই লক্ষ্যচ্যুত করবে। এ দিকটির প্রতি লক্ষ রেখেই প্রাবন্ধিক বলেছেন, 'স্কুলের ন্যায় যে পর্যন্ত বাংলার মাদরাসাতেও বাংলা ভাষা অবশ্য-পাঠ্য দেশীয় ভাষা রূপে স্থান না পাইবে, সে পর্যন্ত আমাদের এ দুরবস্থা ঘুচিবে না।'

মাতৃভাষা উন্নত বা সমৃদ্ধকরণে অন্যান্য ভাষাচর্চা : জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশে বিদেশি ভাষাচর্চার বিকল্প নেই। আর লেখকের মতে তা হচ্ছে নিজ ভাষার সমৃদ্ধি ও দেশের উন্নতিকল্পে; নিজ ভাষার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করে নিজ ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া। প্রাবন্ধিক বলেছেন, "স্কুলের ন্যায় মাদরাসাতেও মাতৃভাষা, প্রধান ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা এই তিন ভাষার চর্চা হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, দ্বিতীয় ভাষা কী হওয়া উচিত? আমি বলি ইংরেজি। ইংরেজি ভাষার সাহায্যে আমাদের মৌলবি সাহেবগণ আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞানের তত্ত্ব পাইবেন।"

উপসংহার : আমাদের ভাষা হবে সহজ-সরল ও প্রাণবন্ত। মাতৃভাষাই আমাদের প্রধান ভাষা। বাংলাতেই আমরা হাসি-কাঁদি, জ্ঞানচর্চা করি। আমাদের কাছে অন্য জাতির ভাষা দুর্বোধ্য, এমন ভাষা সহজে আয়ত্তও করা যায় না। তাই ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাংলার বিকল্প হতে পারে না। বিদেশি ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে কখনো পূর্ণ সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়।

■ প্রশ্ন : খ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'পাদটীকা' গল্পে পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : প্রখ্যাত রম্যলেখক, সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচা কাহিনী' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'পাদটীকা' একটি অসাধারণ গল্প। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে টোল শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতগণ যে দুরবস্থার শিকার হয়েছিলেন, 'পাদটীকা' গল্পের পণ্ডিত মশাই তাদেরই একজন প্রতিনিধি। সৈয়দ মুজতবা আলী আলোচ্য গল্পে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র অঙ্কন করেছেন।

পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ : পণ্ডিত মশাই ছিলেন পণ্ডিত সমাজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বংশানুক্রমে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক-বাহক। লেখক পণ্ডিত মশাইয়ের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "পণ্ডিত মশাইয়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি-গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটুজোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত– অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর।" এ বর্ণনা তৎকালীন একজন পণ্ডিতের যথার্থ পরিচয়। নিচে পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হলো :

প্রাচীনপন্থি ও আত্মগর্বী : ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক পণ্ডিত মশাই ছিলেন প্রাচীনপন্থি, তিনি আত্মগর্বীও বটে। সবাইকে তিনি গো-মূর্খ, অকালকুষ্মাণ্ড ভাবতেন। এমনকি স্কুলের প্রধান শিক্ষককেও তিনি তেমন কোনো গুরুত্ব দিতেন না।

গোঁড়া ও অলস : শিক্ষক হিসেবে পণ্ডিত মশাই ছিলেন গোঁড়া। প্রাচীনের প্রতি তার আকর্ষণ আর নতুনের প্রতি অবহেলা ও ঘৃণা ছিল খুবই প্রবল। ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে বকতেন বেশি এবং তার চেয়েও বেশি টেবিলের উপর পা তুলে ঘুমাতেন।

বাংলা ভাষা বিদ্বেষী : বাংলা ভাষার প্রতি চরম বিদ্বেষী মনোভাব ছিল পণ্ডিত মশাইয়ের। তিনি বাংলা ব্যাকরণের শুধু সংস্কৃত অংশটুকুই পড়াতেন। যেমন– কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি, সমাস ইত্যাদি। লেখক একদিন বাংলা রচনায় 'দোলা-লাগা', 'পাখি-জাগা' ব্যবহার করেছেন বিধায় পণ্ডিত মশাই তার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

প্রাচীন সংস্কৃতের ধারক : পণ্ডিত মশাই ছিলেন প্রাচীন সংস্কৃতের অন্ধভক্ত। তার চিন্তা-চেতনা, চাল-চলনে আধুনিকতার নামগন্ধও ছিল না। সাহিত্যে খাঁটি বাংলা বা চলিত ভাষার ব্যবহার তিনি একদম পছন্দ করতেন না।

অবহেলিত পণ্ডিত মশাই : ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান টোলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। যার কারণে পণ্ডিত মশাই বাধ্য হয়ে স্কুলে বাংলা ব্যাকরণ পড়াতেন। স্কুলে তিনি বেতন পেতেন সবার চেয়ে কম, কিন্তু অবহেলা ও উপহাস পেতেন সবার চেয়ে বেশি।

শ্রদ্ধাকাঙ্ক্ষী : লাট সাহেব স্কুল পরিদর্শন করতে এসে পণ্ডিত মশাইয়ের সাথে করমর্দন করায় তিনি একেবারে বিগলিত হয়ে যান এবং বারবার লাট সাহেবকে সালাম করেন। সামান্য শ্রদ্ধা পেলেই পণ্ডিত মশাই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।

পরোপকারী : পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ি নদীর ওপারে। নৌকা করে তিনি নদী পার হতেন। নৌকা ছিল তার নিজের। কিন্তু প্রায়ই অন্য লোকদেরও সহযোগিতা করতেন তিনি। ছাত্রদের গালাগালি করলেও তিনি তাদের প্রতি ছিলেন খুবই আন্তরিক।

শ্রেণিকক্ষে পণ্ডিত মশাই : পণ্ডিত মশাই শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর দেহের উপরের অংশে প্যাঁচানো চাদরখানা টেবিলে রেখে কটমটিয়ে ছাত্রদের দিকে তাকাতেন। অতঃপর দু'চারটি সংস্কৃত শব্দ পড়িয়ে টেবিলের ওপর পা রেখে ঘুমাতেন। শ্রেণিকক্ষে পণ্ডিত মশাইয়ের এ ধরনের আচরণ খুবই দৃষ্টিকটু ছিল।

শিক্ষক হিসেবে পণ্ডিত মশাই : শিক্ষক হিসেবে পণ্ডিত মশাই ছিলেন গোঁড়া প্রকৃতির। তিনি পেশায়ও আন্তরিক ছিলেন না। ক্লাসে তিনি ঠিকমতো পাঠ না দিয়ে ঘুমাতেন এবং ছাত্রদের গালিগালাজ করতেন।

সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি : লাট সাহেবের আগমনের কারণে স্কুল ছুটি থাকায় তিনদিন পর পণ্ডিত মশাই স্কুলে এসে ক্লাসে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, লাট সাহেবের সাথে আর কে কে এসেছিল? ছাত্ররা যথার্থ উত্তর দিতে পারেনি। লাট সাহেবের সাথে তার কুকুর এসেছিল এবং কুকুরের এক ঠ্যাং ছিল না। ছিল তিন ঠ্যাং। এসব পর্যবেক্ষণ করেছেন পণ্ডিত মশাই।

ধৈর্য ও সহনশীলতা : পণ্ডিত মশাইয়ের অর্থনৈতিক দৈন্যের কোনো সীমা ছিল না। মাত্র পঁচিশ টাকায় তিনি আট সদস্যবিশিষ্ট পরিবার লালন-পালন করতেন। তার গোটা পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের একটি ঠ্যাংয়ের সমান। অর্থাৎ পঁচিশ টাকা বেতন যে তার জীবনে কতো তুচ্ছ– এ বোধ তার মাঝে লজ্জা, তিক্ততা ও ঘৃণার জন্ম দিয়েছে সত্যি, তবুও তিনি ধৈর্যচ্যুত হননি। কারণ তিনি বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই ধৈর্যশীল ছিলেন।

উপসংহার : সৈয়দ মুজতবা আলী 'পাদটীকা' গল্পে পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র অঙ্কন করেছেন নিপুণ শৈল্পিক তুলিতে। পণ্ডিত মশাই লেখককে খুব স্নেহ করতেন। লেখক পণ্ডিত মশাই চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন শিক্ষকদের জীবনের এক করুণ কথাচিত্র অঙ্কন করেছেন।

■ প্রশ্ন : গ ॥ 'পাদটীকা' গল্পে সৈয়দ মুজতবা আলী যে সত্য প্রকাশ করেছেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : 'পাদটীকা' নামক অসাধারণ গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত রম্যলেখক, সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচা কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত। এ গল্পে লেখক তাঁর সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক জীবনের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশদের আগমনের ফলে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। ফলে তখন থেকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের জীবনে নেমে আসে নানা দুর্ভোগ।

'পাদটীকা' গল্পের বেদনাসিক্ত নির্মমতা/সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা/নির্মম সত্য

স্কুলের পণ্ডিত মশাই : গল্পকার যে স্কুলে পড়তেন সে স্কুলের পণ্ডিত মশাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষার একনিষ্ঠ সাধক। তিনি বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। স্কুলে তিনি বাংলা ব্যাকরণের শুধু সংস্কৃত অংশটুকুই পড়াতেন। পড়ানোর চেয়ে বকতেন বেশি এবং তার চেয়েও বেশি ঘুমাতেন টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে।

পণ্ডিত মশাইয়ের ব্যবহার : লেখককে পণ্ডিত মশাই খুব স্নেহ করতেন। তাই সর্বদা তার প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করতেন। অনার্য, শাখামৃগ, দ্রাবিড়সম্ভূত ইত্যাদি ছাড়া তিনি সম্বোধন করতেন না লেখককে। পণ্ডিত মশাইয়ের গায়ের বর্ণ ছিল শ্যাম। মাসে একদিন দাড়ি-গোঁফ কামাতেন এবং হাঁটু-জোকা ধুতি পরতেন। তার গায়ে যে দড়ি প্যাঁচানো থাকত, অজ্ঞরা তাকে চাদর বলে অভিহিত করতো। ক্লাসে এসে একটা অজুহাত নিয়ে বকতে শুরু করতেন। আর যেদিন অজুহাত খুঁজে পেতেন না, সেদিন কৃৎ-তদ্ধিত আলোচনা করে এ মূর্খদের বিদ্বান করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার কথা বলতেন।

পণ্ডিত মশাইয়ের চলাফেরা : পণ্ডিত মশাই সব সময় খালি গায়ে স্কুলে আসতেন। সেবার লাট সাহেব স্কুল পরিদর্শনে এলে তিনি একটি ফুলহাতা গেঞ্জি পরেন এবং অনভ্যাসের কারণে নানা বিপত্তির শিকার হন। লাট সাহেব ক্লাসে এসে পণ্ডিত মশাইয়ের সাথে করমর্দন করায় তিনি বিগলিত হয়ে বারবার ঝুঁকে ঝুঁকে সালাম করেন।

শিক্ষক জীবনের নির্মমতা : তিনদিন ছুটির পর পণ্ডিত মশাই ক্লাসে এসেছেন। লেখককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লাট সাহেবের সাথে যে কুকুরটি এসেছিল তার তিনটি ঠ্যাং আছে, যেটির জন্য মাসিক খরচ পঁচাত্তর টাকা। আর পণ্ডিত মশাইয়ের আট সদস্যবিশিষ্ট পরিবার চলে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে। পণ্ডিত মশাইয়ের পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের কয়টি ঠ্যাংয়ের সমান? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা কারো ছিল না। সমগ্র ক্লাস নিস্তব্ধ। পণ্ডিত মশাইয়ের মুখ লজ্জা, তিক্ততা ও ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। ছাত্ররা বুঝতে পেরেছে, তিনি তাদের সাক্ষী রেখে আত্ম-অবমাননার নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন। ক্লাসের সেই নিস্তব্ধতা হিরণ্ময় ছিল না, সেই নিস্তব্ধতার নিপীড়ন-স্মৃতি ভুলবার নয়।

'পাদটীকা' গল্পে বর্ণিত সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা : ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে সংস্কৃত শিক্ষা প্রায় বিলুপ্ত হতে থাকে। এদেশের অভিভাবকরা বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে সংস্কৃত বাদ দিয়ে সন্তানদের ইংরেজি শিখতে উৎসাহিত করে। ইংরেজির প্রতি মানুষের ঝোঁকপ্রবণতার কারণে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কদরও কমতে থাকে।

অবহেলিত শিক্ষক জীবন : গল্পে পণ্ডিত মশাইয়ের জীবন, সে সময়ের শিক্ষক জীবনের চিরন্তন চিত্র। অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমানেও শিক্ষকসমাজ সবার নিকট অবহেলিত, উপেক্ষিত। পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে অনেকেই সমাজের উঁচু স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু পণ্ডিত মশাইয়ের জীবনযাত্রার কোনো উন্নয়ন ঘটেনি।

সমকালীন শিক্ষায় রাজনৈতিক প্রভাব : ইংরেজরা তাদের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এদেশের মানুষ দেশীয় আদর্শে শিক্ষিত হোক তা চায়নি। তাই মাদরাসা এবং হিন্দুদের টোল উভয়ই ইংরেজদের দৃষ্টিতে অবহেলিত ছিল। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ইংরেজরা এসব প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞার চোখে দেখে।

সমকালীন শিক্ষায় অর্থনৈতিক প্রভাব : ইংরেজদের আগমনের পর এদেশের মানুষ বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সংস্কৃত বাদ দিয়ে ইংরেজি শিখতে সন্তানদের উৎসাহিত করে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্যই তারা ইংরেজি শিখতে আকৃষ্ট হয়।

নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি ও নির্মম সত্য : সংস্কৃতের প্রতি অগাধ আস্থা ছিল বক্ষ্যমাণ গল্পের পন্ডিত মশাইয়ের। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তার তীব্র অনীহা। টোল প্রথা উচ্ছেদের পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্কুলে বাংলা ব্যাকরণের সংস্কৃত অংশ পড়াতেন তিনি। শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তীব্র ক্ষোভের কারণে ক্লাসে যতটা পড়াতেন তার চেয়ে বকতেন বেশি, আর দুই পা টেবিলের ওপর রেখে ঘুমাতেন। জীবনের ওপর প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে বেঁচেছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক পন্ডিত মশাই। তার মাসিক বেতন ছিল মাত্র পঁচিশ টাকা, যা কিনা লাট সাহেবের কুকুরের একটি পায়ের সমান। কুকুরের একটি পায়ের সাথে নিজেকে তুলনা করে তিনি আত্ম-অবমাননার নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখেন। এভাবে গল্পকার 'পাদটীকা' গল্পে রসাত্মক বর্ণনাভঙ্গিতে যে নির্মম সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তা পাঠককে হতচকিত করে।

উপসংহার : সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী 'পাদটীকা' গল্পে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক সমাজের দুর্দশার সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। পন্ডিত মশাই লেখককে খুব স্নেহ করতেন। তাই সব সময় কটু বাক্য বর্ষণ করতেন তাঁর প্রতি। লেখক রসাত্মক রচনার আড়ালে যে নির্মম সত্য প্রকাশ করেছেন তা সত্যি মর্মান্তিক, যা পাঠক হৃদয়কে আন্দোলিত করে।

■ প্রশ্ন : ঘ ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'তৈল' প্রবন্ধের নামকরণের সার্থকতা নিরূপণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : নামকরণের মধ্য দিয়েই কোনো রচনার আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ ফুটে ওঠে। আর সাহিত্যে নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনোরম ও আকর্ষণীয় নামের বদৌলতে পাঠকের মন আলোড়িত হয়, রচনাটি পড়ার আগ্রহ জন্মে। এসব দিক বিবেচনা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও অসাধারণ একটি প্রবন্ধ 'তৈল' প্রবন্ধের নামকরণ করেছেন।

সাহিত্যে নামকরণের রীতি : Literature is the mirror of life. অর্থাৎ, সাহিত্য জীবনের দর্পণ। আর সাহিত্যের দর্পণ হলো নামকরণ। কেননা নামকরণের মাধ্যমেই সাহিত্যকর্মের মূলভাব পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এজন্য প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Cavendis বলেন– A beautiful name is better than a lot of wealth. অর্থাৎ, একটি সুন্দর নাম অনেক সম্পদের চেয়েও উত্তম। আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি শিল্পকর্মকে সার্থক করে তুলতে নামকরণের রীতিনীতি যথাযথ মেনে চলতে হয়।

নামকরণের ভিত্তি : বিভিন্ন রচনা, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদির নামকরণের মাধ্যমে এর অভীষ্ট লক্ষ্য, ভাব ও বক্তব্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখককে বিচক্ষণতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। যথা–

- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য;
- কেন্দ্রীয় চরিত্র;
- নায়ক-নায়িকার নাম;
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা;
- স্থান বা কাল।

'তৈল' প্রবন্ধের নামকরণ : 'তৈল' প্রবন্ধের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখক তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কারণ আমাদের সমাজের সর্বস্তরে এ বিষয়টির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এদিক থেকে মনে করা হয় প্রাবন্ধিক এ নামটি দিয়ে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'তৈল' প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তৈল দিয়ে অর্থাৎ তোষামুদ করে কে কতদূর যেতে পেরেছে আবার তৈল না দেওয়ার কারণে তার যোগ্যতম জায়গায় যেতে পারেনি। আমরা আমাদের সমাজে বা বিশ্ব ব্যবস্থায় দেখি তৈল দেওয়ার বিষয়টি কিছু জায়গায় ইতিবাচক আবার কিছু জায়গায় নেতিবাচক। প্রাবন্ধিক তৈলের সর্বময় ব্যবহার তাঁর 'তৈল' প্রবন্ধটিতে তুলে ধরেছেন।

সভ্যতার বিকাশে চাকার ভূমিকা অপরিসীম। চাকা ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তা লক্ষ্যে পৌঁছে। তবে চাকা এমনি এমনি ঘোরে না। চাকাকে সচল রাখার জন্য চাকার নির্দিষ্ট অংশে তৈল প্রয়োগ করতে হয়। সভ্যতারও একটি চাকা থাকে। সমাজ দেহের চাকাতে উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে সেখানে তৈল দিলে সমাজ সচল থাকে। সমাজের চাকাকে নির্বাচন করাটাই বড় কথা। যে এই সমাজের চাকায় তৈল দিয়ে চলতে পেরেছে সেই সফল হয়েছে। তৈল দিয়ে মানুষের মনকে পরিবর্তন করা যায়। মানুষ সমাজে বাস করতে গিয়ে শুধু টাকাকেই চায় না, সে স্বস্তিও চায়। আমরা দেখি অনেক মানুষের প্রচুর টাকা আছে কিন্তু কোনো শান্তি নেই। সেই মানুষকে যদি তার চরিত্রের কোনো প্রশংসনীয় দিককে তার সামনে উপস্থাপন করা হয় তাহলে সে মনে মনে খুশি না হয়ে পারে না। আসলে সব মানুষই তার মনের অজান্তে ক্ষমতা চায়। সব মানুষের ভেতরই এ বিষয়টি ক্রিয়াশীল আছে– সে হবে পৃথিবীর সেরা মানুষ। এজন্য মানুষ মানুষের কাছে প্রশংসা শুনতে চায়। মানুষের অজান্তে এ বিষয়টি মানুষকে ভালো লাগায়। প্রাবন্ধিক এজন্যই তৈল দিয়ে মানুষের মন ঘোরানোর প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করেছেন।

তৈলের গুণ বহুবিধ। বিশ্বের উন্নত সভ্যতা থেকে শুরু করে একেবারে বর্বর জাতির মধ্যে তৈলের গুণকে লক্ষ করা যায়। তৈল অপচনশীল দ্রব্য। সমাজ কাঠামোর মস্তিষ্কে যে তৈল আছে তা দেখা যায় না, শুধু তা অনুভব করা যায়। এ অনুভব শারীরিক নয়, মানসিক। তৈলের যে গুণের কথা প্রাবন্ধিক বলেছেন তা আসলে মানসিক গুণ।

নামকরণের সার্থকতা বিচার : 'তৈল' প্রবন্ধের নামকরণ এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাঠকের চিন্তার দ্বার উন্মোচন ও প্রসারিত করেছেন, নতুন করে ভাবার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। কেবল নিজেকে চিন্তাবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে নয়; বরং অনেককে চিন্তার ভুবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। সমাজকে তিনি ধরতে চেয়েছেন মানুষের বিবেচনায়। সংগতকারণেই প্রাবন্ধিকের এরূপ নামকরণ সার্থক ও যথার্থ হয়েছে।

উপসংহার : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'তৈল' প্রবন্ধের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে তিনি ব্যঙ্গার্থে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার চিত্র এবং তৎপরবর্তীতে এর বিস্তৃত প্রাসঙ্গিকতার বিষয়াদি তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর 'তৈল' প্রবন্ধটি রসনির্ভর হয়ে পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। আর সমগ্র বিষয়বস্তুর নিরিখে এ প্রবন্ধের নামকরণ 'তৈল' সঠিক, সুন্দর ও সার্থক হয়েছে।

■ প্রশ্ন : ঙ ॥ 'শিউলিমালা' গল্পে প্রেমের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'শিউলিমালা' কাজী নজরুল ইসলামের একটি প্রেমের গল্প। এখানে প্রেমকে শাশ্বত সুন্দর করে মূর্তমান ও মানবিক করা হয়েছে। গল্পে নায়ক-নায়িকার প্রেম গভীর ভাবের সৃষ্টি করলেও তা পরিণতি পায়নি। আশ্বিনের শিউলি ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে নিজের অগোচরে সুবাস ছড়িয়ে যেন ঝরে পড়েছে। গল্পে সবকিছু ছাপিয়ে শিউলি-আজহারের হৃদয়ের প্রেম-ভাবনা মুখ্য হয়ে উঠেছে।

'শিউলিমালা' গল্পে বর্ণিত প্রেমের স্বরূপ : 'শিউলিমালা' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য হলো প্রেম। এ গল্পে নায়ক-নায়িকার মনে প্রেমের কল্লোল তুলেছে। অনুভূতির প্রতিটি দ্বারে প্রেম কড়া নেড়েছে। কাঁপা ঠোঁটের শব্দহীন উচ্চারণে, ভেজা চোখের হাজার পৃষ্ঠার মহাকাব্যে প্রেমের উপস্থিতি এখানে দৃশ্যমান। কম্পনের মাধ্যমে এ প্রেম শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করেনি। আর তাতেই প্রেম এখানে ভিন্নমাত্রায় প্রতিভাত হয়েছে।

রোমাঞ্চকর অনুভূতি : কাজী নজরুল ইসলামের রোমান্টিক গল্প 'শিউলিমালা'য় প্রেমের সূত্রপাত ঘটেছে নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শনেই। প্রথম দেখাতেই নায়ক নায়িকাকে শরতের শিউলির সাথে তুলনা করা হয়েছে। দুজন দুজনকে ভালো লাগা ও ভালোবাসার সূত্রপাত এখানেই। এখানে দেখা যায়, নায়কের অসম্ভব চতুরতায় দাবা খেলা, বিমোহিত সুরে গান গাওয়া নায়িকার মনে দোলা দেয়। ফলে অভিন্ন মানসিকতায় দুটি হৃদয়ের সঙ্গম ঘটে এখানেই।

অব্যক্ত ভালোবাসা : নায়ক নায়িকা উভয়ের হৃদয়ে গভীর প্রেমানুভূতি জাগ্রত হওয়ার পর থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি কথায়, প্রতিটি চাহনিতে ভালো লাগার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বটে কিন্তু তা আনুষ্ঠানিকতার রূপ পায়নি। তাদের প্রেমে গতি এসেছে। হৃদয় রাজ্যে সুখ শিহরন জেগেছে। এ গতি, এ সুখানুভূতি ভাষা হয়ে প্রকাশ পায়নি; অব্যক্তই রয়ে গেছে। ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে অবিরাম। প্রেমে জয়-পরাজয় নেই। খেলার ছলে এ কথাটিও উঠে এসেছে এবং নায়িকার অনুরাগের ভাষা নায়ককে আন্দোলিত করেছে। নায়কের ভাষায়– ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল, আমি যেন ভীরু ভোরের হাওয়া– যত ভালোবাসা, তত ভয়! ও বুঝি ছুঁলেই ধুলায় ঝরে পড়বে! ও যেন পরীর দেশের স্বপ্নমায়া, চোখ চাইলেই স্বপ্ন টুটে যাবে। এ যেন মায়া-মৃগ-ধরতে গেলে হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে।

দেহাতীত প্রেম : প্রেম স্বর্গীয়। প্রেমবিরহ প্রত্যেক মানুষকেই ব্যথাতুর করে, আনমনা করে। মুখ ফুটে যদিও বলা হয়নি, ঘর বাঁধার স্বপ্ন যদিও দেখা হয়নি, তারপরও বিদায় বেলায় মি. আজহার আর শিউলি বিরহকাতর হয়েছে। গল্পকথকের ভাষায়, "আমাদের মালা বিনিময় হলো না– হবেও না এ জীবনে কোনোদিন। কিন্তু কণ্ঠ বদল হয়ে গেল! আর মনের কথা– সে শুধু মনই জানে।" হঠাৎ দেখা হওয়ার পর থেকে দু'জনের হৃদয়েই পরিবর্তন এসেছে। তারা ধরেই নিয়েছিল তাদের এ অনুভূতি, আবেগ মিলনের জন্য নয়; শুধুই ভালো লাগা, ভালোবাসা আর প্রেমের জন্য। তাই তারা কাছে এসেও কাছে আসেনি, স্পর্শ বা আলিঙ্গান চায়নি কোনোদিন।

প্রেমের গভীরতা প্রকাশ : 'শিউলিমালা' গল্পের নায়ক মি. আজহারের দেড় মাস শিলং ভ্রমণের বেশিরভাগ সময় কেটেছে বৃদ্ধ প্রফেসর চৌধুরীর বাসায় অর্থাৎ, শিউলিদের বাসায়। সময়ের হিসাবে অঙ্কটা খুব বড় না হলেও এ সময়টাতেই শিউলির মনে গভীর দাগ কেটেছে– দাগ কেটেছে আজহারের মনেও। মনে প্রেমের প্রবল হাওয়া বইলেও বাইরের দৃশ্যপট ছিল অতি সাধারণ। নায়কের বিদায়ের পূর্ব পরিবেশে শিউলি তার প্রেমকে চেপে রেখেও যেন রাখতে পারেনি। শিউলি ফুলের অঞ্জলি সাজিয়ে পূজারিনির মতো আজহারের টেবিলে রেখেছে। অশ্রুসিক্ত নয়নে নায়কের কাছে জানতে চেয়েছে– "আপনি কি কালই যাচ্ছেন?" উত্তর দিতে গিয়ে আজহারের কণ্ঠও কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এল। পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে হৃদয়াবেগ সংযত করে আস্তে বলল– 'হাঁ ভাই।'

প্রেম ও বিরহ : 'শিউলিমালা' গল্পে দেখা যায়, আশ্বিন মাস আজহার-শিউলির জন্য বিশেষ একটা মাসে পরিণত হয়েছে। 'প্রেম হয়েও হলো না, পেয়েও পাওয়া হলো না' এ ভাবনায় দুজনের হৃদয়েই ঝড় বইছিল। তাইতো আজহারের প্রশ্নের জবাবে শিউলি বলেছে, "আশ্বিন এলে শিউলি ফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ো!" অন্যদিকে আজহার যখন জানতে চেয়েছে– "তুমি কী করবে?" বুকের ভেতরের লুকানো কণ্ঠটা চাপা দিয়ে ঠোঁটে কষ্টের হাসি টেনে বলেছে, "আশ্বিনের শেষে ত শিউলি ঝরেই পড়ে!" শিউলির বিরহকাতর হৃদয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র মূলত এখানেই চিত্রিত হয়েছে। অদৃশ্য প্রেমের অবগাহনে শিউলির গান হয়ে উঠেছে তার ভাষা। এমনিভাবে নায়কের কণ্ঠে সুর হয়ে উঠেছে–

'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে,
এল সোনার গগন রে।'

উপসংহার : প্রেম স্বর্গীয়, প্রেম শাশ্বত। সেই প্রেমের একটি অনবদ্য উপাখ্যান 'শিউলিমালা'। এ গল্পের নায়ক-নায়িকার মনে প্রেম কল্লোল তুলেছে। অনুভূতির দ্বারে প্রেম কড়া নেড়েছে কিন্তু শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করেনি। তাই এখানে প্রেম একটি ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। পেয়েও না পাওয়ার আবহে গল্পটি একটি সার্থক ছোটগল্পের রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং নিতান্তই সুখপাঠ্য হয়ে প্রতীয়মান হয়েছে।

■ প্রশ্ন : চ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সমাপ্তি' গল্পের আলোকে মৃন্ময়ী চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের গল্পাঙ্গনে এক অনন্য ছোটগল্প 'সমাপ্তি'। এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অসাধারণ প্রেম ও প্রণয়ের গল্প। এ গল্পের প্রধান চরিত্র শিক্ষিত যুবক অপূর্ব। তার সাথে প্রেম হয় মৃন্ময়ীর। মৃন্ময়ী গ্রামের এক দুরন্ত মেয়ে। লেখক মৃন্ময়ী চরিত্রের মাধ্যমে একটি চঞ্চল মেয়ের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সংমিশ্রণে গল্পটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গল্পে আরও স্থান পেয়েছে মানবজীবনের সাথে বিশ্ব-প্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্কের বিষয়টি।

মৃন্ময়ীর চরিত্র বিশ্লেষণ : 'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ী চরিত্র এবং প্রকৃতি সমান্তরাল হয়ে ফুটে উঠেছে। মাটি ও প্রকৃতির সঙ্গে মৃন্ময়ী এমনভাবে মিশে আছে যে, অপূর্বর প্রণয়ের দিকে তাকানোর সুযোগ সে পায়নি। নানা দিক থেকে তার চরিত্রটি বৈচিত্র্যময়। নিচে মৃন্ময়ীর চরিত্র বিশ্লেষণ করা হলো :

মৃন্ময়ীর দুরন্তপনা : 'সমাপ্তি' গল্পের নায়ক শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বকৃষ্ণ রায়। গ্রামে বেড়াতে এসে তার এমন একজনের সাথে পরিচয় হয় যে কি-না গ্রামের মানুষের কাছে 'পাগলী' নামে পরিচিত এবং গ্রামের যত রাখাল তার খেলার সাথি। সমবয়সি মেয়েদের প্রতি তার অবজ্ঞার শেষ নেই। লেখকের ভাষায়, 'শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।' অপূর্ব যেদিন বাড়িতে আসে সেদিন সে কাদায় পড়ে গেলে মৃন্ময়ী উচ্চ হাস্যধ্বনিতে ভেঙে পড়ে এবং মেয়ে দেখতে গেলে সেখান থেকে অপূর্বর বার্নিশ করা নতুন জুতা জোড়াটি চুরি করে। মৃন্ময়ী যেন আবার মিশে যায় প্রকৃতির কোলে। অপূর্ব আবার নতুন রূপে মৃন্ময়ীকে আবিষ্কার করে প্রকৃতিরই সান্নিধ্যে। গল্পের ভাষায়– "পুষ্করিণীর ধারে নির্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর ঐ অসংগত চটি জুতা জোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না। অপূর্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নূতন জুতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল।"

অপরিবর্তনীয় আচার-স্বভাব : অপূর্ব পছন্দ করে মৃন্ময়ীকে। পাড়ার সব মানুষ অপূর্বর এ পছন্দকে অপূর্ব পছন্দ বলে নামকরণ করে। তবে অপূর্বর মা এ বিয়েতে বেঁকে বসলেও পুত্রের একান্ত আগ্রহের কাছে তিনি হার মেনে ছেলেকে মৃন্ময়ীর সাথেই বিয়ে দেন। বিয়ের পরও মৃন্ময়ীর সামান্য পরিবর্তন হয় না। আবার লুকিয়ে রাখাল বালকদের সাথে খেলা করতে যায়। এ নিয়ে মৃন্ময়ীর শাশুড়ি তাকে তিরস্কার করে। কিন্তু মৃন্ময়ী প্রকৃতির আশ্রয় ছাড়া আর কোথাও শান্তি খুঁজে পায় না। বিয়ের পরেও সে লুকিয়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। তাই গল্পকার বলেছেন, "অপরাহ্ণে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল, কোথায় গেল, খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়ে বসিয়া ছিল।"

মৃন্ময়ীর আকুল প্রত্যাশা : মৃন্ময়ী তার বাবার কাছে যেতে চায়। তাই গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বনমালীর নৌকায় ওঠে। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় মৃন্ময়ী ধরা পড়ে যায়। তবে গল্পকার এখানে নিদ্রিতা মৃন্ময়ীর যে চিত্র এঁকেছেন তাতে মৃন্ময়ীকে প্রকৃতির কোলে লালিত সন্তান বলেই প্রতীয়মান হয়। যেমন– "ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী– দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।"

একদিন স্বামী অপূর্ব গোপনে মৃন্ময়ীকে তার বাবা ঈশান মজুমদারের কাছে কুশীগঞ্জে নিয়ে যায়। এই যাত্রাপথেই মৃন্ময়ীর মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের আভাস গল্পকার পাঠককে দিয়েছেন। যেমন– গল্পকার বলেছেন– "মৃন্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।... মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভয়ের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহার হৃদয়ের আনন্দ-উদ্‌বেগ সেই সুকোমল স্পর্শযোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।"

মৃন্ময়ীর মানসিক পরিবর্তন : মৃন্ময়ী কুশীগঞ্জে তিনদিন থাকার পর আবার নিজ গ্রামে ফিরে আসে। অপূর্বর মা তাদের উপর রাগান্বিত হয় এবং এ সময় অপূর্বর কলেজ খোলার কারণে মৃন্ময়ীকে তার মায়ের কাছে রেখে কলকাতায় গমন করে। কিন্তু এখান থেকেই মৃন্ময়ীর মানসিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়। মাতৃগৃহে তার আর মন টেকে না। সারাক্ষণ তার একটি স্মৃতি ভর করে থাকে এবং আর একটা শয্যার কাছে গুনগুন করে বেড়াতে থাকে। তারপর থেকে তাকে আর কেউ বাইরে দেখতে পায় না– হাস্যধ্বনিও শুনতে পায় না। অপূর্ব বিচ্ছেদবেদনা তাকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করেছে। এক দুরন্ত বালিকার স্নিগ্ধ রমণী মূর্তিতে পরিণত হওয়ার চিত্র পাঠককে মুগ্ধ করে। সে তার স্বামীকে প্রচণ্ড পরিমাণে অনুভব করে এবং আবার শ্বশুরালয়ে গমন করে। গল্পের ভাষায়– "শাশুড়ি বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক। শাশুড়ি স্থির করিয়াছিলেন, মৃন্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।"

বন্ধুবৎসল মানসিকতা : মৃন্ময়ী সমবয়সি মেয়ে বন্ধুদের প্রতি অবজ্ঞা ভাব প্রদর্শন করলেও ছেলে বন্ধুদের ক্ষেত্রে ছিল বন্ধুবৎসল। এ কারণেই রাখালের পিঠে সজোরে চপেটাঘাত করলেও রাখাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। গভীর বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই পরস্পরের এরূপ হাত চালানো ছিল তাদের নিত্যদিনের ঘটনা। বিয়ের পরে অপূর্বর ঘরে মৃন্ময়ীর বন্ধুবৎসল্যের পরিচয় মেলে। অপূর্ব পড়ালেখার জন্য কলকাতায় যাওয়ার প্রাক্কালে মৃন্ময়ী তাকে আদেশের স্বরেই বলেছে, "তুমি ফিরে আসার সময় রাখালের জন্য একটা তিনমুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

প্রেম-চেতনা : স্বামীর প্রেমকে উপলব্ধির জন্য যে আঘাতের প্রয়োজন ছিল– বিচ্ছেদের দরকার ছিল তা মৃন্ময়ী পেয়েছে। অপূর্বর সাথে কলকাতায় না যাওয়ার কারণে সে নিজেকে দোষারোপ করে এবং মনে মনে বলে "তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শুনিলে কেন। আমার অনুরোধ মানিলে কেন।" অপূর্বর চাওয়া অপরিসমাপ্ত চুম্বনের জন্য সে নিজেকে দোষারোপ করতে থাকে। অপূর্বকে বাড়ি ফিরে আসার জন্য চিঠি লেখে।

মৃন্ময়ী সাহসী : লাস্যময়ী মৃন্ময়ী ছিল অনেক সাহসী। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মৃন্ময়ীর কাছে ভয় আর সাহসের কোনো সংজ্ঞাই ছিল না। যা ইচ্ছা হতো আপন মনে করে যেত। পাত্রপক্ষ দেখতে আসা লজ্জাবতী বালিকার ঘোমটা আচানক সরিয়ে দেওয়া, পাত্রের নতুন জুতো সরিয়ে ফেলা, রাতের অন্ধকারে শ্বশুরালয় থেকে বেরিয়ে এসে নৌকা খোঁজা, এসবকিছুর মূলে ছিল প্রকৃতি প্রদত্ত সরলতা। এ সরলতাই তাকে এত বেশি সাহসী করে তুলেছিল।

পুত্রবধূ হিসেবে মৃন্ময়ী : অবশেষে অপূর্বর মা তার পুত্রবধূকে নিয়ে কলকাতায় গমন করে। কিন্তু সংবাদটি গোপন রাখা হয় অপূর্বর কাছে। অপূর্বও মৃন্ময়ীকে দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠে। ঝড়-বৃষ্টির রাতেই সে তার বাসায় ফিরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপূর্ব সে রাতে ভগ্নীপতির বাসায় থেকে যায়। এরপর যা ঘটে তা হলো, "খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্বণ শব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বন তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর বুঝিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্য বাধায় অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুধারায় সমাপ্ত হইল।"

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অপূর্ব সৃষ্টি মৃন্ময়ী চরিত্র। তার আবহেই 'সমাপ্তি' গল্পটি আবর্তিত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি দুরন্ত কিশোরীর রমণী হয়ে ওঠার চমৎকার গল্প এটি। দুরন্তপনা থেকে প্রেম-ভাবনা, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা তার চরিত্রে বিদ্যমান। সর্বোপরি এ চরিত্রটির মাধ্যমেই 'সমাপ্তি' গল্পের সকল রূপ-রস প্রকাশিত হয়েছে।

গ বিভাগ

মান– ১০ × ২ = ২০

প্রশ্নক্রম-৫ ও ৬ : যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

■ প্রশ্ন : ক ॥ 'বলাকা' কবিতা যেন রবীন্দ্রনাথের স্থবিরতার বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ।– উক্তিটির যথার্থতার পরিচয় দাও।

উত্তর।। উপস্থাপনা : স্থবিরতা কাম্য নয়; গতিই মানবজীবনে প্রাণের সঞ্চার করে। গতিবাদই 'বলাকা' কবিতার মূল কথা। বলাকার বিরামহীন গতি আর এর পাখার শব্দ কবির অন্তরে এক অদ্ভুত কল্পনা জাগ্রত করেছে। সে কল্পনা গতি বা যাত্রার কল্পনা। গতির ছন্দেই বিশ্বের সৌন্দর্য, গতি নিয়েই সৃষ্টি এ বিশ্ব চরাচর। জীবন ও মৃত্যুর প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই গতির প্রবাহ লক্ষণীয়।

'বলাকা' কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থবিরতার বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ : কবির প্রাণের গতির বাহন 'বলাকা' কবিতা। 'বলাকা' তাই সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পূর্ববর্তী কাব্যে কবি প্রকৃতি, মানব ও জীবের সঙ্গে আশ্বস্ত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তার পরে এসেই সুর পরিবর্তন হয়ে গেল। আর এ সুরই বলাকার গতিময়তার সুর। গতির নিত্য স্রোত ও তার ছন্দে পরিবর্তন এ কাব্যে প্রধানভাবে লক্ষণীয়। সবকিছুই বন্ধন থেকে মুক্তির পানে ধাবমান। এ নিরবচ্ছিন্ন চলাতেই তার আনন্দ। আর এ চলার যেন বিরাম নেই, শেষ নেই। এ গতি প্রবাহের গতি যেদিন রুদ্ধ বা বন্ধ হয়ে যাবে সেদিনই জড়ত্ব ও পঙ্গুত্বে মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে। এ কারণেই জড়ত্ব ও পঙ্গুত্বকে জয় করার মানসে কবি সচেতনভাবেই স্থবিরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।

প্রকৃতিতে গতিময়তা : গতির ছন্দ রূপ পেয়েছে 'বলাকা' কবিতায়। কাশ্মীরের ঝিলম নদীর আকাশে তখন সন্ধ্যা। ঝিলমের জল অন্ধকার। প্রকৃতি নিথর। কবি লিখেছেন–

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার;
.....
সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।

বলাকার গতিশীলতা : প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একঝাঁক বুনো হাঁস কবির মাথার উপর দিয়ে পাখা মেলে উড়ে গেল ঝিলম নদীর বুকে। মুহূর্তের মধ্যে দূর থেকে দূরান্তরে উধাও হয়ে গেল। এরই ধারাবাহিকতায় কবি লিখলেন–

হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে– মত্ত তোমাদের পাখা
.....
গিরিশ্রেণি তিমিরমগন
শিহরিল দেওদার– বন।

'বলাকা' চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী : বলাকা গতির বাহন। এটি স্থবির নয়। কবি লক্ষ করলেন, মুহূর্তেই নীরবতা ভেঙে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল হংসের ডানা ঝাপটা। সুস্তময় আকাশ আচমকা আঘাত পেয়ে জেগে উঠল। স্তব্ধতার মৌনতা ভেঙে গেল। রোমাঞ্চিত মনে প্রশ্ন জাগল, একি হলো! তিনি লিখলেন–

মনে হল, এ পাখার বাণী,
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

'বলাকা' নির্জীব চিত্তে প্রাণ সঞ্চারী : হংসবলাকা এক মুহূর্তে পুলকিত বেগের আবেগ জাগিয়ে দিল। চিত্তে জাগল চলার বাসনা। আকাশে সুদূরে হারিয়ে যাওয়ার জন্য অন্তর আকুল হলো। সেই উদাসী পাখার ব্যথিত বাণীতে পৃথিবীর প্রাণেও জাগল এক আকুলতা। সেই বাণী যেন মুখর হয়ে উঠল ব্যথা আর বেদনার সুরে। যেমন–

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে–
হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।

কবির অনুভূতি : কবির অনুভবে 'বলাকা' কবিতায় গতির সুর বেজে উঠেছে। আর গতিবাদই হলো 'বলাকা'র অন্তর্নিহিত ভাব। বলাকার বিরামহীন গতি এবং তার পাখার শব্দ কবির অন্তরে অদ্ভুত কল্পনার বীজ বুনেছে। সে কল্পনা গতি বা যাত্রার কল্পনা। প্রকৃতির একটি উপযুক্ত পরিবেশে কবির গতি-অনুভূতি বিস্ময়কর সমগ্রতা লাভ করেছে। এ অনুভূতির গতির সঙ্গে কবি মানসের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাই কবি দুনিয়ার সকল জড়ত্ব ও পঙ্গুত্বকে দূরে ঠেলে দিয়ে স্থবিরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন; গতির জয়গানের সুর তুলেছেন। এ অনুভূতি কবির একান্ত নিজস্ব।

উপসংহার : 'বলাকা' কবিতায় কবি অনুভব করেন সৃষ্টির মূলে রয়েছে এক অফুরন্ত গতিবেগ। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিরন্তর পরিবর্তনের এক প্রবাহ চলে। আলোচ্য কবিতায় কবি-মননের সেই সুরই ধ্বনিত হয়েছে। কবি যেহেতু গতির উপাসক সেহেতু তাঁর কাব্যিক ভাষাও গতিময়তার অনুরূপ। হংস বলাকার পাখার ধ্বনি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই 'বলাকা' কবিতা যেন স্থবিরতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচেতন বিদ্রোহ– উক্তিটি যথার্থ।

■ প্রশ্ন : খ ॥ 'উমর ফারুক' কবিতা অবলম্বনে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর চারিত্রিক মাহাত্ম্যের পরিচয় দাও।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : উমর ফারুক (রা) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। তাঁর খেলাফতের সময়সীমা ছিল দশ বছর। 'ফারুক' হযরত উমরের উপাধি। তিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পেরেছেন বলে তাঁকে 'ফারুক' উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি ছিলেন সত্যের একজন দৃঢ়চিত্ত উপাসক। বীরত্ব, কোমলতা, সাম্য, নির্ভীকতা ইত্যাদি নানা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি ভাস্বর ছিলেন।

উমর ফারুক (রা)-এর চারিত্রিক মাহাত্ম্যের পরিচয়

শ্রেষ্ঠ বীর : উমর (রা) ছিলেন কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ বীর। তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে নামাজের জন্য প্রকাশ্যে আজান দেওয়ার রীতি ছিল না। কুরাইশদের ভয়ে মুসলমানরা উচ্চৈঃস্বরে আজান দিতে সাহস পেত না। কিন্তু হযরত উমর (রা) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন প্রকাশ্যে আজান দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়।

সত্যের উপাসক : একজন সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে হযরত উমরের খ্যাতি চির অম্লান। 'ফারুক' হযরত উমরের উপাধি। যিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন তাকেই ফারুক বলা হয়। হযরত উমর (রা) ছিলেন তেমনি একজন প্রধান সাহাবি যাকে সত্যের একজন দৃঢ়চিত্ত উপাসক বলা যায়। তাই কবি বলেছেন–

তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনিকো কারে ভয়,
সত্যব্রত তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়।

তাওহিদের ঝান্ডাবাহী উমর : হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে পৌত্তলিক ছিলেন। কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ বীর, রাসুল (স) এবং ইসলামের ভয়ংকর দুশমন– উমর খুন-তৃষ্ণায় তৃষ্ণিত হয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ছুটে এসেছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর শিরশ্ছেদের অভিপ্রায়ে। কিন্তু সেদিন রক্তপানে তৃপ্ত হয়ে নয়, তাওহিদের অমীয় সুধায় অশান্ত হৃদয় শান্ত করে মহানবি (স)-এর পদতলে ক্ষুরধার তরবারি সমর্পণ করে উমর (রা) আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কাফিরদের ভয়ে ভীত হয়ে আর গোপনে তাওহিদের বাণী প্রচার নয়, উমর (রা)-এর হাত ধরে এভাবে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছে স্বমহিমায় ও প্রকাশ্যে।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন : অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহ হযরত উমর (রা) ছিলেন একেবারেই সাধারণের কাতারে, সাদামাটা। তাঁর না ছিল রাজপ্রাসাদ; না ছিল ব্যক্তিগত প্রহরী। মসজিদে নববীর খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তিনি। ঘুমিয়েছেন খেজুর পাতার ছাওয়া আর পাথরের দেওয়াল ঘেরা সামান্য গৃহে। কবির ভাষায়–

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখতে বসি
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি।

সাম্যের ধারক-বাহক : হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্যের ধারক-বাহক। তিনি রাজা-প্রজাকে একচোখে দেখেছেন। ভৃত্য-মনিবের সম্পর্কে তৈরি করেছেন এক নতুন ইতিহাস। জেরুজালেমের পথ ধরে চলার সময় তপ্ত মরুর উত্তপ্ত বালিকণার মাঝে ভৃত্যকে উটের পিঠে বসিয়ে নিজে উটের রশি ধরে হেঁটেছেন। এমন সাম্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন বলেই কবি বলেছেন–

ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষেরে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।

ভয়-ডরহীন বিচক্ষণ শাসক : হযরত উমর (রা) এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ শাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহামানব। এ কারণেই জেরুজালেমের গির্জায় তাঁকে সালাত আদায়ের অনুরোধ করা হলেও তিনি তা করেননি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি যদি সেখানে সালাত আদায় করেন তাহলে ভবিষ্যতে মুসলমানগণ এটাকে বরকতময় বিবেচনা করে গির্জাকে মসজিদে রূপান্তর করে নেবে। হযরত উমরের এ বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে কবি বলেছেন–

তার তরে নয়, আমি যদি হেথা আজ
নামাজ আদায় করি, তবে কাল অন্ধ লোকসমাজ
ভাবিবে– খলিফা করেছে ইশারা হেথায় নামাজ পড়ি....।

হযরত উমর (রা) বীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে পদচ্যুত করেন। কারণ ক্রমেই জনগণের মনে ধারণা হচ্ছিল যে, মুসলমানদের জয়ের একমাত্র কারণ খালিদের বীরত্ব। এ মহাবীরের দুর্দান্ত রণকৌশল তাঁকে সামান্যতম শঙ্কিত করেনি। কবির ভাষায়–

সিপাহ-সালারে, ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।

মানবপ্রেমিক : খলিফা হযরত উমর (রা) ছিলেন মানবপ্রেমিক। তিনি রাতের আঁধারে মদিনার অলিতে-গলিতে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট অবলোকন করতেন। নিজ হাতে সমস্যার সমাধান করতেন। উনুন জ্বালিয়ে শূন্য হাড়িতে রান্নার অভিনয় করে সন্তানদের সান্ত্বনা দেওয়া মাকে দেখে খলিফা উমর অঝর ধারায় চোখের পানি ঝরিয়েছেন। ছুটে গেছেন বাইতুল মালের খাদ্য গুদামে। নিজের পিঠে আটার বস্তা বহন করে নিয়ে গেছেন দুখিনী মায়ের তাঁবুতে। নিজ হাতে রুটি তৈরি করে তুলে দিয়েছেন ক্ষুধার্ত সন্তানদের মুখে।

ন্যায়বিচারের প্রতীক : পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বিচারকদের অন্যতম ছিলেন হযরত উমর (রা)। নিজ সন্তান আবু শাহমাকে মদ্যপানের অপরাধে আশিটি বেত্রাঘাতের হুকুম দিয়েছিলেন। জল্লাদের প্রহার মনঃপূত না হওয়ায় নিজ হাতে চাবুক তুলে নিয়েছেন। নিজ হাতে প্রিয় সন্তানের পিঠে চাবুকের পর চাবুক মেরেছেন। ছেলের কান্না, আর্তনাদ, ক্ষমাপ্রার্থনা কিছুই তাকে দমাতে পারেনি। নিজের চাবুকের আঘাতে চোখের সামনে সন্তান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। তাইতো বলা যায়, তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারের প্রতীক।

ব্যবহার ও বেশভূষায় সাধারণ রীতি অবলম্বন : হযরত উমর (রা) একজন সাধারণ প্রজার সমপরিমাণ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। প্রজারা যা পরিধান করতেন তিনিও তাই পরিধান করতেন। প্রজারা যে মানের খাদ্যগ্রহণ করতেন তিনিও সেই মানের খাদ্যগ্রহণ করতেন। রাজকার্য চালানোর জন্য, বিদেশি মেহমানের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বিশেষ ধরনের অতিরিক্ত পোশাক তাঁর ছিল না। কখনো কখনো প্রয়োজনীয় পোশাকের অভাবে রাজসভায় যেতে তাঁর দেরি হয়ে যেত। কবি বলেছেন–

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
'কোথায় খলিফা' কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,
একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে,
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে।

উপসংহার : হযরত উমর ফারুক (রা) ছিলেন মানবপ্রেমিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহামানব। তিনি রাজা-প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর হাত ধরে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছে স্বমহিমায়। তাঁর জীবন ছিল একেবারেই সাদামাটা। তাঁর না ছিল রাজপ্রাসাদ, না ছিল ব্যক্তিগত প্রহরী। বীরত্ব, কোমলতা, নিষ্ঠা তাঁর চরিত্রের ভূষণ। এভাবে 'উমর ফারুক' কবিতা অবলম্বনে তাঁর চরিত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায়।

■ প্রশ্ন : গ ॥ 'উমর ফারুক' কবিতার মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : ইসলাম সত্য, সুন্দরের, মানবতা ও শান্তির ধর্ম। মহানবির (স) সম্মানিত সাহাবিরা ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের আদর্শকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সম্মানিত সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত উমর (রা)। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। তাঁর জীবনাদর্শ, চরিত্র-মাহাত্ম্য, মানবিকতা এবং সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি 'উমর ফারুক' কবিতায় সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

'উমর ফারুক' কবিতার ভাববস্তু/মূল বক্তব্য : 'উমর ফারুক' কাজী নজরুল ইসলামের একটি বিখ্যাত কবিতা। এখানে দেখা যায়, তিমির রাত্রি, দূর মসজিদে এশার আযান প্রিয়হারা কার কান্নার মতো কবির বুকে এসে বিঁধেছে। আযান শুনে তিনি উঠে পড়লেন, কারণ আযানের মধ্যে উমর (রা)-এর স্মৃতি বিজড়িত আছে। উমর ছিলেন কোরাইশ বংশোদ্ভূত শ্রেষ্ঠ বীর। তিনি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন, তখন প্রকাশ্যে আযান দিতে আর কোনো বাধা রইল না। তাই কবি নজরুল বলেছেন–

তোমার স্মৃতি যে আযানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)। তিনি বিশাল রাষ্ট্রের অধিপতি হয়েও বাস করতেন খেজুর পাতায় ছাওয়া ঘরে। অতঃপর কবি হযরত উমর (রা)-এর কিছু গুণগানের মাধ্যমে ইসলামের সোনালি ইতিহাস স্মরণ করেছেন। যেমন, কবি বলেছেন–

ইসলাম সে তো পরশমানিক, তারে কে পেয়েছে খুঁজি
পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।

কবিতায় বর্ণিত এক ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে উমর (রা) জেরুজালেম যাচ্ছেন। কখনো তিনি নিজে উটের পিঠে চড়েছেন, ভৃত্য রশি টেনে ধরে, আবার কখনো ভৃত্য উটের পিঠে বসে আছে, খলিফা রশি ধরে উট টেনে নিয়েছেন। তাঁরা যখন জেরুজালেম পৌঁছান তখন সেখানকার লোকেরা দেখল– ভৃত্য উটের পিঠে বসে আছে আর খলিফা উটের রশি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এ ঘটনায় তাঁকে একজন সাম্য ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসক বলা যায়।

খলিফা উমর (রা) সন্ধিপত্রে সই করার পর নামাজ পড়ার জন্য গির্জার বাইরে যেতে চাইলেন। তাঁকে গির্জায় নামাজ আদায়ের অনুরোধ জানানো হলো, তিনি রাজি হলেন না। বললেন, এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পরবর্তীকালে মুসলমানরা গির্জাকে ইঙ্গিত করে মসজিদ বানাবে। তাই কবি বলেছেন–

ইসলাম এ নহে কো ধর্ম, নহে খোদার বিধান,
কারো মন্দির গির্জারে করে ম'জিদ মুসলমান।

হযরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায়বিচারের প্রতীক। বিশাল সাম্রাজ্যর অধিপতি হয়েও তিনি নিজের পিঠে এক দুখিনী মায়ের জন্য খাবার বহন করে নিয়ে যান এবং এ ব্যাপারে অন্যের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন। কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়েও তিনি অপরাধ ক্ষমা করেননি। মদ্যপানের অপরাধে নিজ পুত্রকে দোররা মেরেছেন। ছেলে অনেকবার ক্ষমা চাওয়ার পরও তিনি ক্ষমা করেননি; বরং দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন–

অপরাধ করে তোরি মতো স্বরে কাঁদিয়াছে অপরাধী।

ন্যায়ের আদর্শ সমুন্নত রাখতে নিজের চাবুকের আঘাতে চোখের সামনে পুত্র মৃত্যুবরণ করেছে, তবুও তিনি ক্ষান্ত হননি। 'আইন সবার জন্য সমান' এ উক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি।

খলিফা উমর (রা) ছিলেন একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্রে একাধারে বীরত্ব, কোমলতা, নিষ্ঠা ও সাম্যবাদী আদর্শের অনন্য সমন্বয় ঘটেছিল। বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হয়েও তিনি অতি সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেছেন। তিনি ছিলেন আমির-উল-মুমেনিন। রাসুলুল্লাহ (স) তাঁকে আদর্শবান ব্যক্তিত্ব বলে বিশ্বাস করেই বলেছিলেন, তাঁর পরে যদি কেউ নবি হতেন, তাহলে তিনি হতেন উমর। তাই কবি বলেছেন–

আজ বুঝি– কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর–
মোর পরে যদি নবি হতো কেউ, হতো সে এক উমর।

উপসংহার : হযরত উমর (রা)-এর চরিত্রে একাধারে বীরত্ব, কোমলতা, নিষ্ঠা এবং সাম্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমা আরব সাম্রাজ্য থেকে মিশর ও তুর্কিস্তানের সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। একজন ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক ও গণতন্ত্রমনা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি চির অম্লান। কাজী নজরুল ইসলাম 'উমর ফারুক' কবিতায় হযরত উমর (রা)-এর এ গুণগুলো সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

■ প্রশ্ন : ঘ ॥ 'বনলতা সেন' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতিপ্রেমের যে মানসচিত্র অঙ্কন করেছেন, তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর।। উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা। প্রকৃতিপ্রেমে বিভোর হয়ে প্রকৃতিকে উপজীব্য করে তিনি তাঁর কাব্যের ডালি পরিপূর্ণ করেছেন। প্রকৃতির সোঁদামাটি, ঘাসফুল, সমুদ্র, নদী আর সবুজ চত্বর প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের দিকে তিনি বারবার ছুটে গেছেন। তাঁর অমর সৃষ্টি 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনি প্রকৃতিপ্রেমের এক অনন্য মানসচিত্র অঙ্কন করেছেন এবং প্রকৃতিবিনাশী সভ্যতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি-সংলগ্ন জীবনের আকাঙ্ক্ষাই উচ্চকিত করেছেন।

প্রকৃতিপ্রেমের স্বরূপ : কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক কবি। প্রকৃতিকে খুব আপন মনে করে তিনি জীবনতরীকে সফলতার বন্দরে নিয়ে যান। প্রকৃতির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে জীবন ও জগতের সকল অশান্তি, ক্লান্তি আর অবসাদ ভুলতে শিখেছেন তিনি। প্রাকৃতিক উপাদানকে উপজীব্য করে তিনি তাঁর কাব্যদেহকে সুষমামন্ডিত করেছেন। 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনি প্রাকৃতিক উপাদানের অনুপম ব্যবহার ও নান্দনিক বিন্যাস করে তার প্রকৃতিপ্রেমের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। কবিতাটিতে তিনি খুব দরদমাখা হৃদয়ে, কলমের শৈল্পিক ছোঁয়ায় নিশীথের অন্ধকার, ধূসর জগৎ, সমুদ্র সফেন, বিদিশার রাত, শ্রাবস্তীর কারুকার্য, সবুজ ঘাসের দেশ, দারুচিনি দ্বীপ, পাখির নীড়, শিশিরের শব্দ, রৌদ্রের গন্ধ, সন্ধ্যার আগমন প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়েছেন। এছাড়াও কবিতাটিতে এসেছে চিল, জোনাকি এবং নদীর প্রসঙ্গ, যার প্রতিটি প্রকৃতির অংশ। সবশেষে কবিতার নামটিও প্রকৃতির উপাদানে কল্পিত বনলতা, অর্থাৎ বনের লতা। তাই ভাবের সঙ্গে ভাষা, শব্দ ও উপমা প্রয়োগের সামঞ্জস্যে এবং প্রাকৃতিক উপাদানের নিপুণ ব্যবহারে কবিতাটিতে কবির প্রকৃতিপ্রেমের অনন্য স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

প্রকৃতির সমগ্রতায় লীন : 'বনলতা সেন' কবিতায় প্রকৃতির সমগ্রতায় লীনতা প্রত্যাশী কবি হাজার বছর ধরে প্রকৃতির বুকের ওপর দিয়ে পথপরিক্রমায় ক্লান্ত। সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর সবখানে ঘুরেছেন তিনি, কিন্তু কোথাও শান্তি নেই। অতীতের দিকে চোখ মেলেও দেখেছেন, সেখানেও কোনো শান্তি ছিল না। ইতিহাসের বিভিন্ন সভ্যতার কাছেও আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু সেখানেও কোনো শান্তি পাননি। অবশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত কবিকে প্রকৃতিই এনে দিয়েছে শান্তি-সুখ। তাই কবি প্রকৃতিকে মানবীয় রূপ দিয়ে তার জন্য রচনা করেছেন প্রশস্তি গান। কবির ভাষায়–

আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

হাজার বছরের পথপরিক্রমায় কবির 'ক্লান্তপ্রাণ' দেখেছে চারদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন, এ জীবন প্রকৃতি-সংলগ্ন জীবন।

প্রকৃতির আশ্রয় : গভীর সমুদ্রে প্রকৃতির সর্বনাশা ঝড়ে হাল ভেঙে নাবিক দিশেহারা হয়ে পড়ে। অনিশ্চিত পথের যাত্রী হয়ে সে প্রকৃতির অকূল সাগরে ভাসতে থাকে। এ অবস্থায় নাবিক যখন সবুজ ঘাসের দেশ দারুচিনি দ্বীপ আবিষ্কার করে, তখন সে নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে বাঁচার জন্য। সকল হতাশা দূর করে সেই দ্বীপ তখন তার মনে শান্তি ও স্বস্তি বিলায়। প্রকৃতিরূপ নারী বনলতা সেন কবির সেই দ্বীপ, যাকে দেখে কবি শান্তি ও সুখনীড়ের আশ্রয় অনুভব করেছেন।

প্রাকৃতিক উপমার প্রয়োগ : প্রকৃতিপ্রেমী কবি আঠারো পঙ্‌ক্তিতে রচিত 'বনলতা সেন' কবিতায় নানা উপমার প্রয়োগ করেছেন। প্রত্যেকটিতে তিনি প্রাকৃতিক উপাদানের শৈল্পিক ব্যবহার করেছেন। কবিতায় বনলতা সেনের চোখ উপমিত হয়েছে পাখির নীড়ের সঙ্গে, চুল বিদিশার রাতের সঙ্গে, মুখ শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সঙ্গে, সন্ধ্যা নেমেছে শিশিরের শব্দের মতো। বনলতা সেন দেখা দিয়েছে সমুদ্রে দিশাহারা নাবিকের চোখে দারুচিনি দ্বীপের ভেতর সবুজ ঘাসের দেশের অপার শান্তি নিয়ে। এভাবে কবি উপমাতে তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের হৃদয় নিংড়ানো প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।

নারী প্রকৃতিরই অপর নাম : যুগে যুগে পুরুষ তার সংকট, সমস্যা, বিক্ষুব্ধতা ও বিপর্যস্ততায় প্রকৃতির কোলে শান্তি খোঁজে। নারীই পুরুষের প্রেরণা, যাত্রাপথে নারীর জয়ধ্বনিই পুরুষের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। কর্মক্লান্ত পুরুষ নারীপ্রেমের আঁচলে শান্তির পরশ পায়। নারীর প্রেরণা পেয়েই পুরুষ সাগর পাড়ি দেয়, পাহাড় ডিঙায়। জীবনে শক্তি, সাহস ও সাধনার প্রেরণা আসে নারী থেকেই। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জটিল অশান্ত জীবনে বনলতা সেন গভীর আশ্বাসে কবির খোঁজ নিয়েছেন; বিশ্বাসে, আশ্রয়ভরা মমতায় নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন। এভাবে নারীর কোমল নীড়ে কবি আশ্রয় নেন। নিকষ কালো অন্ধকার বিদিশার রাতের মতো ঘন দিঘল কালো চুল, শ্রাবস্তী নগরীর ভাস্কর্যের মতো অপরূপ মুখাবয়ব নিয়ে বনলতা সেন কবিকে দিয়েছে পরম প্রশান্তি।

জীবনের সব আলো নিভে গেলে, জীবনসংগ্রামে নেতিয়ে পড়া পুরুষের জীবনে ক্লান্তি নেমে এলে নারীকে নিয়ে শান্তির নীড় রচনার নিরন্তর প্রত্যাশা রয়েই যায়। যুদ্ধোত্তর সংকটময় জীবনে কবি বনলতাকে চিত্রিত করেছেন তৃপ্তির উপাদান হিসেবে, অনাবিল ও অবর্ণনীয় শান্তির প্রতীক এবং চিরন্তন মানসপ্রতিমারূপে।

বনলতা সেন কেবল পুরুষের বিশেষ নারীরূপে মূর্ত নয়; বরং যুগ যুগান্তরের ক্লান্ত পুরুষের স্বস্তির জমিন। তার পাখির নীড়ের মতো সৌম্য শান্ত চোখে মায়ার প্রীতির অঞ্জন জীবনচলা শেষে রাতের অন্ধকারে বনলতা সেনরূপ নারীর মুখোমুখি ঠাঁই নিয়েছে। কবির সর্বৈব চপলতা শান্ত-শীতল হয়ে এসেছে। শাশ্বত পুরুষ শাশ্বত নারীর হৃদয়-জমিনে বেঁধেছে শান্তির নীড়। এক অপরূপ মমতা আর অনন্যধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিতে কবি প্রকৃতির রূপমাধুর্য চিত্রিত করেছেন।

প্রকৃতির বিবর্ণতা : এক সময় দিনের আলো নিভে যায়। ধীর পায়ে সন্ধ্যা নেমে আসে শিশিরের মতো নিঃশব্দে। ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল। পৃথিবীর সব রং মুছে যায়। সব পাখি ঘরে ফেরে, চারদিকে নেমে আসে ধূসরতা। এভাবে পৃথিবীর সবরকম দৃষ্টিগোচর দৃশ্য আঁধারে ঢেকে যায়। তখন জোনাকির আলো ঝিলমিল করে নতুন গল্প শুরু করে। আরম্ভ হয় সময়ের নতুন পর্যায়। রজনীর গভীরতায় পিনপতন নীরবতায় প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব দ্যোতনা, এক অনন্য রোমান্টিক পরিবেশ।

উপসংহার : প্রকৃতির উদার আকাশের নিচে, সবুজ বিস্তীর্ণ চত্বরে, সবুজের কোলে লালিত-পালিত হন কবি জীবনানন্দ দাশ। তাই প্রকৃতিকে উপজীব্য করে তিনি নিজের কাব্যের ডালিকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রশস্তি গেয়েছেন দৃষ্টিনন্দন রূপময় প্রকৃতির লাবণ্যের। প্রেয়সীর সাথে নিবিড়ভাবে মিলিত হওয়ার জন্য খুঁজেছেন প্রকৃতির নির্জনতা। 'বনলতা সেন' কবিতার মধ্য দিয়ে কবির প্রকৃতি-সংলগ্নতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। আলোচ্য কবিতায় অপূর্ব শব্দচয়ন, অনন্য ভাষাশৈলী, অকল্পনীয় চিত্রকল্প নির্মাণ, অনুপম উপমা প্রয়োগ ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভাবনায় কবির প্রকৃতিপ্রেমের মানসচিত্র ফুটে উঠেছে।

■ প্রশ্ন : ঙ ॥ 'বনলতা সেন' কবিতার ভাব ও কাব্য সৌন্দর্য বিচার কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'বনলতা সেন' বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের এক অনন্য সৃষ্টি। ত্রিশোত্তর কবি হিসেবে আধুনিক কাব্যরীতি আর স্বদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রেরণা জীবনানন্দ দাশকে বাংলা কাব্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্ধারণ করে দেয়। তাঁর সেই স্বতন্ত্র চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ হলো 'বনলতা সেন'। গভীর প্রেমানুভূতি, ভৌগোলিক বিস্তৃতি, ইতিহাস চেতনা, উপমার প্রয়োগ, ছন্দের কারুকার্য প্রভৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে এ কবিতায়।

'বনলতা সেন' কবিতার মূলভাব

প্রেমানুভূতির প্রকাশ : 'বনলতা সেন' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ যে প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা সমগ্র পুরুষ জাতির অনুভূতিকে স্পর্শ করেছে। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্ত মানুষ প্রতিনিয়ত শান্তির অন্বেষণ করে চলে। কাঙ্ক্ষিত শান্তির জন্য সে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ফেরে, কিন্তু শান্তির ঠিকানা সে পায় না। অনন্তকালের পথপরিক্রমায় কবিজীবনে যেসব অশান্তি সমুদ্রের সফেন হয়ে জমেছিল, তা আজ তাঁর মানসপ্রতিমা বনলতা সেনরূপী প্রেয়সী নারীর ভালোবাসার স্পর্শে নির্মল হয়ে উঠেছে।

ভৌগোলিক ধারণা : 'বনলতা সেন' কবিতাটি ভৌগোলিক ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ, ঐতিহ্যমণ্ডিত এক অনন্যধর্মী কবিতা। তিনি পৃথিবীর পথে হাজার বছর ধরে হেঁটেছেন। তাই এ কবিতায় স্থান পেয়েছে সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর, নাটোর, বিদিশা, শ্রাবস্তী, সবুজ ঘাসের দেশ, দারুচিনি দ্বীপ ইত্যাদি স্থানের নাম, যা কবিতাটিকে বৈশ্বিক পটে স্থান দিয়েছে।

ইতিহাস চেতনা : ইতিহাস চেতনা 'বনলতা সেন' কবিতাটিকে এক স্বতন্ত্র মহিমা দান করেছে। কবি নিজেই বলেছেন, কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার। কবির অস্থিমজ্জায় মিশে থাকবে ইতিহাস চেতনা, চিত্তে থাকবে পরিচ্ছন্ন কাণ্ডজ্ঞান। 'বনলতা সেন' কবিতায় তাঁর সার্থক প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় এভাবে–

সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে,
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।

মানসপ্রতিমার সন্ধান লাভ : দিনের শেষে নিঃশব্দ চরণে সন্ধ্যা নামে। দিনের সকল কোলাহল থেমে যায়। শিশিরের পতন বৃষ্টির মতো মৃদু শব্দ করে, চিলের ডানায় রোদের গন্ধ মুছে যায়, মুছে যায় পৃথিবীর সব রং, চারদিকে নেমে আসে ধূসরতা। পৃথিবীর সব আলো তখন দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। জোনাকিরা আলো ঝিলমিল করে নতুন গল্পকাহিনি রচনার জন্য পাণ্ডুলিপির আয়োজন করে। আরম্ভ হয় সময়ের নতুন পর্যায়। পাখিরা তাদের নীড় খুঁজে বেড়ায়। স্তব্ধ হয়ে যায় নদীতীরের গুঞ্জন।

'বনলতা সেন' কবিতার কাব্য সৌন্দর্য

শাব্দিক সুষমা : কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতায় এমন সব শব্দের প্রয়োগ করেছেন, যার জন্য একে শাব্দিক সুষমায় ভূষিত কবিতা বলে অভিহিত করা যায়। এ কবিতায় বিম্বিসা, অশোক, বিদিশা, শ্রাবস্তী ও বিদর্ভ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার আমাদের কয়েক হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাসের সাথে পরিচিত করে তোলে। পাখির নীড়, শিশিরের শব্দ, ক্লান্ত প্রাণ, দারুচিনি দ্বীপ, রৌদ্রের গন্ধ, সবুজ ঘাস ইত্যাদি শব্দের সমন্বিত রূপ কবিতাটিকে কাব্যিক সুধায় সমৃদ্ধ করেছে।

উপমার শৈল্পিক প্রয়োগ : আঠারো পঙ্‌ক্তিতে রচিত এ ছোট্ট কবিতায় কবি শব্দের যথার্থ প্রয়োগে যেমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি উপমার শৈল্পিক বিন্যাসে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এতে তিনি অসাধারণ দক্ষতায় নানা উপমার প্রয়োগ করেছেন। বনলতা সেনকে তিনি তুলনা করেছেন অন্ধকার বিদিশা নগরীর রাতের সাথে, তার মুখকে তুলনা করেছেন শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সাথে এবং চোখকে তুলনা করেছেন পাখির নীড়ের সাথে। কবির ভাষায়–

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

আলোচ্য কবিতায় সন্ধ্যা নেমেছে শিশিরের মতো নিঃশব্দে, হাল ভাঙা দিশেহারা নাবিক স্বস্তি পেয়েছে যেমন সবুজ ঘাসে ঘেরা দারুচিনি দ্বীপ দেখে, কবির অশান্ত মনও তেমনি স্বস্তি পেয়েছে বনলতা সেনকে দেখে।

ভাব-সম্পদ : 'বনলতা সেন' কবিতাটি ভাব-সম্পদের দিক থেকে ঋদ্ধ, আকর্ষণীয়। প্রেম মানবসত্তার এক শাশ্বত অনুভূতি। শাশ্বত কালের এ মধুর অনুভূতি নিয়েই গড়ে উঠেছে এ কবিতাটি। নীড় সন্ধানী পথিক হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুরে প্রেমের যে ব্যাকুলতা, কবি অসাধারণ শিল্প চাতুর্যে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি তাকে দাঁড় করিয়েছেন এক শাশ্বত কল্যাণী নারীর নীড়ের মুখোমুখি। প্রেম-প্রীতিদাত্রী এ দুই সত্তা পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে প্রেমের মিষ্টি-মধুর অনুভূতি নিয়ে। এ অমূল্য ভাব-সম্পদে পরিপুষ্ট জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি।

চিত্রকল্প : শৈল্পিক শব্দচয়নে সংযত 'বনলতা সেন' কবিতায় কবি যে চিত্রকল্পের জন্ম দিয়েছেন, তা বাংলা সাহিত্যে অনন্য। কবি বহু ভাষণে কবিতাটিকে দীর্ঘায়িত না করে খুব অল্প কথায়, নির্বাচিত শব্দ ও উপমার ঝংকারে তার ভাব প্রকাশ করেছেন। রূপক ও অলংকার প্রয়োগের স্থলে কবি নিপুণভাবে প্রতীক ও চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ করেছেন, যা বক্তব্য অপেক্ষা ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে অধিকতর ক্রিয়াশীল। যেমন, কবি বলেছেন–

হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর।

এ চিত্রকল্প যেন পাঠককে উপনীত করে এক মোহনীয় ব্যঞ্জনার সেই স্বপ্নময় দারুচিনি দ্বীপে। ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের এবং স্পর্শেরও বটে।

প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার : প্রাকৃতিক উপাদান নিয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্যের ডালি পূর্ণ করেছেন। 'বনলতা সেন' কবিতা প্রাকৃতিক উপাদানের অনুপম ব্যবহার ও নান্দনিক বিন্যাসে অপরূপ হয়ে উঠেছে। কবিতাটিতে পাখির নীড়, বিদিশার রাত, শিশিরের শব্দ, দারুচিনি দ্বীপ, ঘাসের দেশ, রৌদ্রের গন্ধ, সমুদ্র সফেন, ধূসর জগৎ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়ের চমৎকার সম্মিলন ঘটেছে। এছাড়া কবিতাটিতে এসেছে চিল, জোনাকি এবং নদীর প্রসঙ্গ। যার সবকটি প্রকৃতির অংশ। সবশেষে কবিতার নামটিও প্রকৃতির উপাদানে কল্পিত বনলতা অর্থাৎ বনের লতা। তাই হাজার বছরের পথপরিক্রমায় ক্লান্ত কবি যে প্রকৃতির সমগ্রতায় লীনতা প্রত্যাশী, তা সুস্পষ্ট। ফলে ভাবের সঙ্গে ভাষা, শব্দ ও উপমা প্রয়োগের সামঞ্জস্য এবং প্রাকৃতিক উপাদানের নিপুণ ব্যবহারে কবিতাটি হয়ে উঠেছে অনন্য।

কবিতার অনন্য ভঙ্গি : 'বনলতা সেন' জীবনানন্দ দাশের এক অসামান্য কবিতা, যা বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। যুগ যুগ ধরে সাহিত্য অনুরাগীদের চিত্তে এক অনাবিল ভাব-কল্পনার উদ্রেক করে চলেছে। তাঁর কবিতার অনন্যতা তাঁকে বাংলা কাব্যজগতে স্বতন্ত্র আসনে আসীন করেছে।

আধুনিক কবিতা হিসেবে মূল্যায়ন : প্রকৃতিপ্রেমী কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' একটি উৎকৃষ্ট আধুনিক কবিতা। এ কবিতার ভাব, ভাষা, শব্দচয়ন, অলংকার, ছন্দ সবই আধুনিক। কিন্তু আধুনিক কবিতার যে অন্যতম উপাদান দুর্বোধ্যতা ও অশ্লীলতা; তা এ কবিতায় নেই। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস বিদ্যমান। একজন শান্তি প্রত্যাশী মানুষ সভ্যতার সুদীর্ঘ পথ বেয়ে আধুনিক সভ্যজগতে পৌঁছে শান্তির অন্বেষণে বিভোর। পথ চলতে চলতে সে প্রত্যাশিত মানবীর সন্ধান পেয়েছে নাটোরে এসে। কল্পিত সে মানবীর নাম বনলতা সেন। এ বনলতা সেন সৌন্দর্য ও শান্তির প্রতীক।

উপসংহার : প্রাকৃতিক উপাদানের শৈল্পিক ব্যবহারে, চিত্রকল্প নির্মাণে, ভাষা ও ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগে, ইতিহাস চেতনার প্রবাহ সৃষ্টিতে 'বনলতা সেন' বাংলা সাহিত্যে একটি বহুমাত্রিক অসাধারণ আধুনিক কবিতা। এ কবিতার মাধ্যমে কবির ব্যক্তিমানসের রোমান্টিক অনুভূতির সার্থক প্রকাশ আর মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের অনিন্দ্য সৌন্দর্যের দিকটি শৈল্পিকভাবে কাব্যিক ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে।

■ প্রশ্ন : চ ॥ "আমার পূর্ব বাংলা একটি অসামান্য আধুনিক কবিতা।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : সৈয়দ আলী আহসান বাংলা কবিতার আধুনিকতার অন্যতম রূপকার। কবিতাকে শিল্প-সৌন্দর্যে অনুপম করার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়। আর এ অনন্য সাধারণ শিল্পবোধের অন্যতম স্বাক্ষর বহনকারী কবিতা হচ্ছে 'আমার পূর্ব বাংলা'। এ কবিতার বিষয়বস্তু কবির মাতৃভূমির সৌন্দর্য-প্রীতি, নিসর্গ চেতনা ও স্বদেশপ্রেম। কবির বাংলার রূপ-সৌন্দর্যকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি কবিতাটিকে আধুনিক রূপদান করেছে।

অসামান্য/সার্থক আধুনিক কবিতা 'আমার পূর্ব বাংলা' : বাংলা কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম রূপকার সৈয়দ আলী আহসান। কবিতাকে শিল্প-সৌন্দর্যে অনুপম করার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়। এ অনন্য সাধারণ শিল্পবোধের অন্যতম স্বাক্ষর বহনকারী কবিতা হচ্ছে 'আমার পূর্ব বাংলা'। নিচে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটিকে একটি সার্থক আধুনিক কবিতা বলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করা হলো :

প্রথমত, বাংলার রূপ-সৌন্দর্যকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এ কবিতায় রোমান্টিকতা ও আবেগের নিবিড়তা লক্ষণীয়। রোমান্টিক কবিদের এটা এক ধরনের বৈশিষ্ট্য। সে অর্থে সৈয়দ আলী আহসান নিঃসন্দেহে একজন আধুনিক রোমান্টিক কবি। 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবি লিখেছেন–

আমার পূর্ব-বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মতো
কালো-কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি।

দ্বিতীয়ত, কবি 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় বিষয়, বক্তব্য এবং বহিঃপ্রকাশের সংগত যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। পূর্ব বাংলার প্রাকৃতিক ও ঐতিহ্যিক দ্যোতনায় একটি সম্পূর্ণতা আনয়নের প্রয়াসে কবিতাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা শিহরিত আলোড়ন পরিলক্ষিত হয়। কবির মনের গভীরে দেশ সম্পর্কে তাঁর আজীবনের ধারণা, দেশের প্রকৃতি ও মানুষকে দেখার অভিজ্ঞতা, দেশবাসী যেভাবে প্রকৃতি ও জন্মভূমিকে ভোগ করে এবং ভালোবাসে, সে সম্পর্কে উপলব্ধি করেছেন।

তৃতীয়ত, প্রকৃতি ও মানুষের মিশ্রিত জীবন সংগ্রাম ও ঐতিহ্যলালিত চিরাচরিত মনোভঙ্গি রসগ্রাহিতা ও আত্ম-উন্মোচনের বৈশিষ্ট্য 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি যেমন করে ছবিতে ও চিন্তায় ধীরে ধীরে সঞ্জাত হয়েছিল, সে সবই যেন 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় একসঙ্গে উৎসারিত। একই সাথে মিলিত হয়েছে কবির আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, রসচেতনার বৈশিষ্ট্য, মানস-প্রকৃতির নিজস্ব স্বকীয়তা।

চতুর্থত, 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবি বাংলার প্রকৃতির এক অসাধারণ রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। এ কবিতায় এদেশের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী, কবরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্ত, অশেষ অনুভব নিয়ে পুলকিত সচ্ছলতা, একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল, বর্ষার অন্ধকারের অনুরাগ ইত্যাদি উপমা, অনুপ্রাস প্রয়োগে কবি আধুনিক মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চমত, আধুনিক কবিতার আঙ্গিক ও প্রকরণ সম্পর্কে কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একজন শিল্প-সচেতন কবি হিসেবে গদ্য ছন্দেই তিনি অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটিও গদ্য ছন্দেই লেখা। এ কবিতায় শব্দ, অলংকার, রূপক, চিত্রকল্প ব্যবহারে তাঁর নিজস্ব রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি এক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের প্রচ্ছায়ায় আধুনিক শিল্পসম্মত প্রয়োগ-কৌশল অবলম্বন করেছেন।

ষষ্ঠত, 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় কবির শব্দ ব্যবহারে তাঁর নিজস্বতা লক্ষণীয়। শব্দের মধ্যে সজীবতা ও দ্যোতনা সৃষ্টির পারঙ্গমতা তাঁকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এ কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে একটা ঝংকার বা ব্যঞ্জনা রয়েছে, যা হৃদয়ের অনুভূতিতে তরঙ্গিতভাবে উচ্চকিত করে।

সপ্তমত, 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটির উপকরণ স্বদেশের অপার সৌন্দর্য থেকে আহরিত বলে সকলের নিকট তা সহজগ্রাহ্য ও প্রশংসনীয়। এ কবিতায় আহরিত উপকরণসমূহ বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবিতাটিতে এক ধরনের মনন-ধর্মিতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও পরিশীলিত-পরিশ্রুত চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাই যৌক্তিকভাবেই কবিতাটি আধুনিক কবিতা হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে।

উপসংহার : 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় শব্দ প্রয়োগে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এর বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নানা উপমা ও চিত্রকল্প সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া সৈয়দ আলী আহসান একজন আধুনিক মননশীল কবি। তাঁর ধ্যান-ধারণা আধুনিক ও প্রকৃতি-নির্ভর। সব মিলিয়ে বলা সমীচীন যে, 'আমার পূর্ব বাংলা' একটি অসামান্য আধুনিক কবিতা।

ঘ বিভাগ

মান— ৫ × ৪ = ২০

প্রশ্নক্রম-৭ ও ৮ : যে-কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

■ প্রশ্ন : ক ॥ ভাষা কাকে বলে? সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য লেখ।

উত্তর।। উপস্থাপনা : জন্মের পরই মানবশিশু চিৎকার করে। সে চায় ভাব বিনিময় করতে, যোগাযোগ করতে। মানব মনে প্রতিনিয়ত ভাবের উদয় হয়। এসব ভাবের বিনিময় ও পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে যে শব্দ বা অর্থপূর্ণ ধ্বনি ব্যবহার করা হয়, তাকে ভাষা বলে।

ভাষার সংজ্ঞা

সাধারণ কথায়, মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে যেসব অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণ করে, তাকে ভাষা বলে। এ বিষয়ে নিচে কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা দেওয়া হলো :

১. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন,** "মনুষ্য জাতি যেসব ধ্বনি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা।"

২. **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে,** "মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোনো বিশেষ জনসমাজের ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।"

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

সাধু রীতি ও চলিত রীতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে উভয় ভাষা রীতির পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো :

পার্থক্যগত বিষয়	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
১. সংজ্ঞা	যে ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন পুরোপুরি মেনে চলে, তাকে সাধু ভাষা বলে।	বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক ব্যবহৃত বা মৌখিক ভাষাকে চলিত ভাষা বলে।
২. ব্যাকরণ অনুসরণ	সাধু ভাষা ব্যাকরণের অনুসারী।	চলিত ভাষা ব্যাকরণের অনুসারী নয়।
৩. শব্দের প্রয়োগ	সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।	চলিত ভাষায় তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।
৪. স্থিরতা	সাধু ভাষা অপরিবর্তনীয়।	চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল।
৫. ব্যবহার	গদ্য, সাহিত্য, চিঠিপত্র ও দলিল লিখনে এ ভাষার ব্যবহার যথোপযুক্ত।	চলিত ভাষা বক্তৃতা, আলোচনা ও নাট্য সংলাপের জন্য উপযুক্ত।

পার্থক্যগত বিষয়	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
৬. পদবিন্যাস	সাধু ভাষায় পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ধারিত।	চলিত ভাষায় পদবিন্যাস সর্বদা সুনির্ধারিত নয়।
৭. অনুসর্গ	এ রীতিতে অনুসর্গ হচ্ছে– হইতে, থাকিয়া, চাইতে ইত্যাদি।	এ রীতিতে অনুসর্গ হচ্ছে– হতে, থেকে, চেয়ে ইত্যাদি।
৮. প্রকৃতি	সাধু ভাষা কৃত্রিম।	চলিত ভাষা কৃত্রিমতা বর্জিত।
৯. সন্ধি, সমাসের ব্যবহার	সাধু ভাষায় সন্ধি ও সমাসের আধিক্য লক্ষণীয়।	চলিত ভাষায় সন্ধি, সমাস বর্জন করে সহজ করে লেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
১০. কর্মবাচ্যের ব্যবহার	সাধু ভাষায় কর্মবাচ্যের ব্যবহার অপ্রচলিত নয়।	চলিত ভাষায় সংস্কৃতানুসারী 'এ' কর্মবাচ্যের ব্যবহার একেবারেই অচল।
১১. স্বর সংগতি	সাধু ভাষায় স্বর সংগতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার বর্জনীয়।	চলিত ভাষায় স্বর সংগতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার লক্ষণীয়।
১২. সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার	এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার পূর্ণাঙ্গ রূপে হয়ে থাকে।	এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের আধুনিক ও সংকুচিতরূপ ব্যবহৃত হয়।
১৩. আঞ্চলিক প্রভাব	এ ভাষায় কোনো আঞ্চলিক প্রভাব নেই।	এটা আঞ্চলিক প্রভাবাধীন।
১৪. ধ্বন্যাত্মক শব্দ	সাধু ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্য নেই বললেই চলে।	চলিত ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্য বেশি। যেমন– কনকন, ঝনঝন, ঠনঠন।
১৫. নব ও প্রাচীন	সাধু ভাষা বেশ প্রাচীন।	চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।
১৬. বোধগম্যতা	সাধু ভাষা সকলের বোধগম্য নয়।	চলিত ভাষা সকলের বোধগম্য।
১৭. সময়গত	সাধু ভাষা বলতে ও লিখতে সময় বেশি লাগে।	চলিত ভাষা বলতে ও লিখতে সময় কম লাগে।
১৮. উদাহরণ	এখনো সে ফিরিয়া আসে নাই। তোমাকে কাছে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।	এখনো সে ফিরে আসেনি। তোমাকে কাছে পেয়ে আমি ধন্য হলাম।

উপসংহার : সাধু ও চলিত ভাষা নিজ নিজ বিশেষ নিয়ম অনুসারে বাংলা ভাষার দুটি বিশেষ ধারাকে পরিপুষ্ট করে চলেছে। তাই একই সঙ্গে এ দুটি ভাষার সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ বর্জনীয়। সচেতনতার সাথে এ দুটি রীতিকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ব্যবহার করা উচিত।

■ প্রশ্ন : খ ॥ বাংলা ভাষা কাকে বলে? সাধু ও চলিতরীতির পার্থক্য লেখ।

উত্তর ।।উপস্থাপনা : জন্মের পরই মানবশিশু চিৎকার করে। সে চায় ভাব বিনিময় করতে, যোগাযোগ করতে। মানব মনে প্রতিনিয়ত ভাবের উদয় হয়। এসব ভাবের বিনিময় ও পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে যে শব্দ বা অর্থপূর্ণ ধ্বনি ব্যবহার করা হয়, তাকে ভাষা বলে।

বাংলা ভাষার সংজ্ঞা :

বাংলা ভাষা : যে অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির সাহায্যে বাঙালিরা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাই বাংলা ভাষা। অন্যকথায়, বাঙালি যে ভাষায় কথা বলে সেটাই বাংলা ভাষা।

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

সাধু রীতি ও চলিত রীতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে উভয় ভাষা রীতির পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো :

পার্থক্যগত বিষয়	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
১. সংজ্ঞা	যে ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন পুরোপুরি মেনে চলে, তাকে সাধু ভাষা বলে।	বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক ব্যবহৃত বা মৌখিক ভাষাকে চলিত ভাষা বলে।
২. ব্যাকরণ অনুসরণ	সাধু ভাষা ব্যাকরণের অনুসারী।	চলিত ভাষা ব্যাকরণের অনুসারী নয়।
৩. শব্দের প্রয়োগ	সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।	চলিত ভাষায় তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।
৪. স্থিরতা	সাধু ভাষা অপরিবর্তনীয়।	চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল।
৫. ব্যবহার	গদ্য, সাহিত্য, চিঠিপত্র ও দলিল লিখনে এ ভাষার ব্যবহার যথোপযুক্ত।	চলিত ভাষা বক্তৃতা, আলোচনা ও নাট্য সংলাপের জন্য উপযুক্ত।

পার্থক্যগত বিষয়	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
৬. পদবিন্যাস	সাধু ভাষায় পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ধারিত।	চলিত ভাষায় পদবিন্যাস সর্বদা সুনির্ধারিত নয়।
৭. অনুসর্গ	এ রীতিতে অনুসর্গ হচ্ছে– হইতে, থাকিয়া, চাইতে ইত্যাদি।	এ রীতিতে অনুসর্গ হচ্ছে– হতে, থেকে, চেয়ে ইত্যাদি।
৮. প্রকৃতি	সাধু ভাষা কৃত্রিম।	চলিত ভাষা কৃত্রিমতা বর্জিত।
৯. সন্ধি, সমাসের ব্যবহার	সাধু ভাষায় সন্ধি ও সমাসের আধিক্য লক্ষণীয়।	চলিত ভাষায় সন্ধি, সমাস বর্জন করে সহজ করে লেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
১০. কর্মবাচ্যের ব্যবহার	সাধু ভাষায় কর্মবাচ্যের ব্যবহার অপ্রচলিত নয়।	চলিত ভাষায় সংস্কৃতানুসারী 'এ' কর্মবাচ্যের ব্যবহার একেবারেই অচল।
১১. স্বর সংগতি	সাধু ভাষায় স্বর সংগতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার বর্জনীয়।	চলিত ভাষায় স্বর সংগতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার লক্ষণীয়।
১২. সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার	এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার পূর্ণাঙ্গ রূপে হয়ে থাকে।	এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের আধুনিক ও সংকুচিতরূপ ব্যবহৃত হয়।
১৩. আঞ্চলিক প্রভাব	এ ভাষায় কোনো আঞ্চলিক প্রভাব নেই।	এটা আঞ্চলিক প্রভাবাধীন।
১৪. ধ্বন্যাত্মক শব্দ	সাধু ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্য নেই বললেই চলে।	চলিত ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্য বেশি। যেমন– কনকন, ঝনঝন, ঠনঠন।
১৫. নব ও প্রাচীন	সাধু ভাষা বেশ প্রাচীন।	চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।
১৬. বোধগম্যতা	সাধু ভাষা সকলের বোধগম্য নয়।	চলিত ভাষা সকলের বোধগম্য।
১৭. সময়গত	সাধু ভাষা বলতে ও লিখতে সময় বেশি লাগে।	চলিত ভাষা বলতে ও লিখতে সময় কম লাগে।
১৮. উদাহরণ	এখনো সে ফিরিয়া আসে নাই। তোমাকে কাছে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।	এখনো সে ফিরে আসেনি। তোমাকে কাছে পেয়ে আমি ধন্য হলাম।

উপসংহার : সাধু ও চলিত ভাষা নিজ নিজ বিশেষ নিয়ম অনুসারে বাংলা ভাষার দুটি বিশেষ ধারাকে পরিপুষ্ট করে চলেছে। তাই একই সঙ্গে এ দুটি ভাষার সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ বর্জনীয়। সচেতনতার সাথে এ দুটি রীতিকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ব্যবহার করা উচিত।

■ প্রশ্ন : গ ॥ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (পরীক্ষায় যে-কোনো পাঁচটি লিখতে হবে) :

উপজেলা, ঘরজামাই, দুধভাত, নদীমাতৃক, প্রতিদিন, মনমাঝি, হাতেখড়ি, গণতন্ত্র, সপ্তাহ, বই-পত্র, গৃহান্তর, অভাব।

উত্তর ।।

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
উপজেলা [দা. বি. '১৯; কু. বি.; আ. বি. '২০]	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
ঘরজামাই	ঘরে আশ্রিত যে জামাই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
দুধভাত [কু. বি.; দা. বি. '২০]	দুধ মিশ্রিত ভাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
প্রতিদিন [কু. বি.; দা. বি. '২০]	দিন দিন	অব্যয়ীভাব
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
হাতেখড়ি [কু.বি.; দা. বি. '২০]	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	অলুক বহুব্রীহি
গণতন্ত্র [ফা.প. (সম্মান) '১৮]	গণের তন্ত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
সপ্তাহ [কু.বি.; ই. বি. '২০]	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু কর্মধারয়
বইপত্র	বই ও পত্র	দ্বন্দ্ব সমাস
গৃহান্তর	অন্যগৃহ	নিত্য সমাস
অভাব	ন-ভাব	নঞ তৎপুরুষ সমাস

■ প্রশ্ন : ঘ ॥ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (পরীক্ষায় যে-কোনো পাঁচটি লিখতে হবে) :

অনুচর, অত্যন্ত, উক্ত, একুশে, কুলীন, ক্রেতা, কর্তব্য, খেলনা, চৌকিদার, ডুবন্ত, ঢাকাই, দয়ালু, পার্থিব।

উত্তর ।।

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
অনুচর [কু. বি. '২০]	√অনু + চর + অ	কৃৎ প্রত্যয়
অত্যন্ত	অতি + অন্ত	তদ্ধিত প্রত্যয়
উক্ত	√বচ্ + ক্ত	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
একুশে [আ. বি. '১৯]	একুশ + এ	তদ্ধিত প্রত্যয়
কুলীন [কু. বি. '২০]	কুল + ঈন	তদ্ধিত প্রত্যয়
ক্রেতা	√ক্রী + তৃচ	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
কর্তব্য [কু. বি. '১৯]	√কৃ + তব্য	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
খেলনা	√খেল্ + অনা	কৃৎ প্রত্যয়
চৌকিদার [কু. বি.; দা. বি. '২০]	চৌকি + দার	তদ্ধিত প্রত্যয়
ডুবন্ত [কু. বি. '২০]	√ডুব্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
ঢাকাই [কু. বি.; দা. বি. '২০]	ঢাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
দয়ালু [কু. বি. '২০]	দয়া + আলু	তদ্ধিত প্রত্যয়
পার্থিব [ই. বি.; কু. বি. '২০]	পৃথিবী + ষ্ণ (অ)	তদ্ধিত প্রত্যয়

■ প্রশ্ন : ঙ ॥ উপসর্গ কাকে বলে? বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : উপসর্গ বাংলা ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলা ভাষার শব্দসমূহ বিভিন্ন উপায়ে গঠিত হয়ে থাকে। অর্থহীন কিছু শব্দাংশের সাহায্যে বাংলা ভাষার অনেক শব্দ গঠিত হয়েছে।

উপসর্গের সংজ্ঞা

উপসর্গ অর্থ উপসৃষ্টি। যেসব অর্থহীন শব্দাংশ ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনপূর্বক নানা অর্থের সৃষ্টি করে, তাকে উপসর্গ বলে। যেমন– আ + হার = আহার, বি + হার = বিহার। এখানে 'আ' ও 'বি' উপসর্গ।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. **ড. এনামুল হক বলেন,** "যে সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নামপদের পূর্বে বসে শব্দগুলোর অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, ঐ সকল অব্যয় শব্দকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে।"

২. **ড. রামেশ্বর শ' বলেন,** "শব্দ ও ধাতুর আদিতে যা যোগ হয়, তাকেই বলে উপসর্গ।"

৩. **ড. অশোক মুখোপাধ্যায় বলেন,** "কিছু অব্যয় আছে যারা ধাতু বা শব্দের আগে যুক্ত হয়ে তাদের অর্থ বদল করে দেয়, এদেরকেই বলা হয় উপসর্গ।"

বাংলা শব্দগঠনে উপসর্গের ভূমিকা

উপসর্গগুলো নিজে অর্থহীন; কিন্তু যখন এগুলো ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে তখন অর্থযুক্ত হয়। এদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই বলে এরা কখনো পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। শব্দগঠনে অর্থের দিক থেকে বৈচিত্র্য আনাই উপসর্গের কাজ। উপসর্গের প্রভাবে একটি শব্দের যে পরিবর্তন হয় তা হলো–

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।
২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়।
৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে।
৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে।
৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

উদাহরণ : 'কাজ' একটি শব্দ। এর আগে 'কু' বা 'অ' শব্দাংশ যুক্ত করলে হবে কুকাজ বা অকাজ। যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে। 'পূর্ণ' শব্দের আগে 'পরি' উপসর্গ যোগ করায় হয়েছে 'পরিপূর্ণ'। এটি 'পূর্ণ' শব্দের সম্প্রসারিত রূপ। 'হার' শব্দের আগে 'আ' যুক্ত করে 'আহার' (খাওয়া), 'প্র' যুক্ত করে 'প্রহার' (মারা), 'বি' যুক্ত করে 'বিহার' (ভ্রমণ) বিভিন্ন অর্থে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে।

উপসংহার : শব্দগঠনে অর্থের দিক থেকে বৈচিত্র্য আনয়নই উপসর্গের কাজ। এরা অর্থহীন শব্দাংশ যা ধাতুর পূর্বে বসে অর্থের পরিবর্তন, সংকোচন, সম্প্রসারণ বা পূর্ণতা সাধন করে।

■ প্রশ্ন : চ ॥ বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।
***অথবা,* আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।**

উত্তর ।। বাংলা একাডেমি/আধুনিক বাংলা বানানরীতি : বাংলা বানানের জটিলতা দূর করার জন্য কতিপয় নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি/আধুনিক/প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম নিচে আলোচনা করা হলো :

১. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয়ই শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি ু হবে। যেমন– কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, উর্ণা, উষা।
২. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন– অর্জ্জন, উর্দ্ধ্ব, কর্ম্ম ইত্যাদির পরিবর্তে অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম হবে।
৩. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন– অহম্ + কার = অহংকার। এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম। সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন– অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল।
৪. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন– ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন– দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।
৫. বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন– কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন ইত্যাদি।

■ প্রশ্ন : ছ ॥ বিভিন্ন বিরামচিহ্নের নাম লেখ এবং সংক্ষেপে এদের ব্যবহার রীতি উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ।। দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।) এর নিয়ম ও ব্যবহার :

১. বাক্যের মধ্যে বক্তব্য সমাপ্ত হলে অথবা অর্থ পরিপূর্ণভাবে নির্দেশ করলে বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে। যেমন– শীতকালে এদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকে। আমি বই পড়ি। সে মাদরাসায় যায়।
২. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে। যেমন– এদিকে এসো।
৩. নির্দেশাত্মক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে। যেমন– সদা সত্য কথা বলবে।

কমা বা পাদচ্ছেদ (,) এর নিয়ম ও ব্যবহার :

১. এমন বাক্য প্রায়ই দেখা যায়, যা দুই বা ততোধিক খণ্ডবাক্যের সমষ্টি। এ বাক্যগুলোকে আলাদা করার জন্য কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন– বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন বিভিন্ন বয়সের মুক্তিযোদ্ধা, তাঁদের কারও বয়স পনেরোর নিচে, কারও ষাটের ওপরে।
২. সমজাতীয় একাধিক পদের ব্যবহার থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন– কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি।

সেমিকোলন (;) এর নিয়ম ও ব্যবহার :

১. দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলে বাক্য দুটির মাঝখানে সেমিকোলন বসে। যেমন– তিনি দুপুরে রুটি খান; আমি তার খাওয়ার পক্ষপাতী।
২. দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের বৈপরীত্য থাকলে বাক্য দুটির মাঝখানে সেমিকোলন বসে। যেমন– মুক্তিযোদ্ধারা চেয়েছিল স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে; রাজাকাররা চেয়েছিল গোলামি করে বাঁচতে– দু'দলের মধ্যে এটাই মূল তফাৎ।

প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর নিয়ম ও ব্যবহার :

১. বাক্যে কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্ন চিহ্ন বসে। যেমন– তোমার নাম কী? সে কি যাবে? তুমি কখন এলে?
২. কোনো বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় থাকলে বাক্যের মধ্যে প্রশ্ন চিহ্ন বসে। যেমন– তিনি ১৯৭১ (?) সালে মারা গিয়েছিলেন।

বিস্ময়চিহ্নের নিয়ম ও ব্যবহার :

১. আনন্দ, বিষাদ, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি বোঝাতে বাক্যের শেষে বিস্ময়চিহ্ন বসে। যেমন– এই দৃশ্য! ওহ! আর সহ্য হয় না!
২. আবেগসূচক অব্যয় পদের শেষে বিস্ময়চিহ্ন বসে। যেমন– জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণাঙ্গনে।

হাইফেন (-) এর নিয়ম ও ব্যবহার :

১. সমাসবদ্ধ পদ তৈরিতে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন– রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।
২. কোনো কোনো উপসর্গের পর হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন– অ-তৎসম, বে-আক্কেল।

ড্যাশ (–) চিহ্নের নিয়ম ও ব্যবহার :

১. বাক্যের মধ্যে গতির প্রয়োজন হলে ড্যাশ চিহ্ন বসে। যেমন– এতে তোমাদের সম্মান কমবে না– বাড়বে।
২. অসম্পূর্ণ বাক্য বা বক্তব্য প্রকাশে ড্যাশ চিহ্ন বসে। যেমন– এত সুন্দর মেয়েটি– বাস দুর্ঘটনায় মারা গেল।

কোলন (:) এর নিয়ম ও ব্যবহার :

১. একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন– মহাবিশ্বের মূল কথা : বহুর মধ্যে ঐক্য।

২. শিরোনাম ও উপশিরোনাম-এর মাঝে কোলন বসে। যেমন– কুমিল্লা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

উদ্ধারচিহ্ন ('-'), ("-") এর নিয়ম ও ব্যবহার :

১. বক্তার উক্তি বা বক্তব্য প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরতে হলে উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। যেমন– সে বলল, "তুমি কি যাবে?"

২. কখনো বাক্যস্থিত কোনো শব্দকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হলে ঐ শব্দের ওপর উদ্ধরণ চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন– ভৃত্যের নিকট 'সাহেব' অর্থে মালিক বোঝাবে।

বন্ধনী ( ), { }, [ ] এর নিয়ম ও ব্যবহার :

১. এই তিনটি চিহ্নই গণিত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে বাক্যের কোনো অংশের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে বন্ধনী চিহ্ন বসে। যেমন– ত্রিপুরা (বর্তমানে কুমিল্লা) জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

২. উদ্ধৃতির উৎস দেখাতে গিয়ে উদ্ধৃতির শেষে বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে মূল রচনা বা তারিখের উল্লেখ করতে হয়। যেমন– আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে? (আদর্শ ছেলে)

বিকল্পচিহ্ন (/) :

১. বাক্যের মধ্যে একটি পদের বিকল্পে অন্য পদকে বোঝাতে বিকল্পচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন– আখ্যাপত্রে গ্রন্থের সংকলক/ সম্পাদকের নাম মুদ্রিত আছে।

২. কবিতার লাইন গদ্যাকারে সাজাতে বিকল্পচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন– অগ্নিবীণা বাজাও তুমি/কেমন করে।

■ প্রশ্ন : জ ॥ ভাব-সম্প্রসারণ লেখ :

(১) স্বদেশের উপকারে নাই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।

(২) 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'।

উত্তর ।। (১) স্বদেশের উপকারে নাই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।

মূলভাব : যার দ্বারা নিজ দেশের কোনো উপকার হয় না সে মানুষ নয়। সে পশুর সমতুল্য।

সম্প্রসারিত ভাব : পাখি ভালোবাসে তার নীড়কে, অরণ্যের ভয়াল জন্তুও ভালোবাসে গহীন বনকে, মানুষও ভালোবাসে তার দেশকে-পরিচিত পরিবেশকে। যেখানে সে লালিত হয় অপরিসীম মমতায়। মাতা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষার প্রভাব প্রতিটি মানুষের দেহে, মনে-প্রাণে বিদ্যমান। অন্তঃসলিল ফল্গুধারার মতো মাতৃভূমি আমাদের জীবনের মর্মমূলে থেকে চালিত করছে অনন্তকাল। দেশপ্রেম তাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। যে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বেড়ে ওঠে; সে পরিবেশের প্রতি, সেখানকার মানুষের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক মমতা ও আকর্ষণ গড়ে ওঠে, তাই আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সে গেয়ে ওঠে–

'আমার এ দেশেতে জন্ম, যেন এ দেশেতেই মরি।'

এ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিমাত্রই যে দেশের কল্যাণের জন্য চিন্তা করবে সেটা মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পড়ে। স্বদেশের উপকার মানুষকে ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ থেকে রক্ষা করে তাকে ব্যাপক বৃহত্তের মধ্যে সুযোগ করে দেয়। মানুষের মানবীয় প্রবৃত্তিগুলো এর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। তাই প্রতিটি মানুষমাত্রই কর্তব্য দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। দেশপ্রেমিক মহান ব্যক্তি দেশের এবং তার দেশের অধিবাসীর কল্যাণের জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকেন। দেশের কল্যাণের স্বার্থে তাদের চেষ্টার অন্ত থাকে না। মানুষের স্বদেশপ্রেমের এ বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে বর্তমান থাকে না তাকে প্রকৃতপক্ষে মানুষ বলে অভিহিত করা চলে না। স্বদেশপ্রেমহীন ব্যক্তি পশুর মতো বিবেচনাহীন এবং ভয়ংকর হয়ে থাকে। স্বদেশপ্রেম, মানবতার উদারবাণী এদের পাষাণ হৃদয় ভেদ করতে পারে না। এরা আত্মকেন্দ্রিক, স্বীয় স্বার্থ ছাড়া মানবকল্যাণে এদের কোনো ভূমিকা থাকে না। স্বার্থ-চিন্তা এদের অন্ধ করে দেয়। ফলে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পশুর মতো আচরণ করতে এদের এতটুকু বাধে না। পারিপার্শ্বিকতা তাকে বাধা দিলে অমানবিক ও হিংস্র হয়ে ওঠে তার আচরণ। তখন পশু এবং তার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। বিবেক-বুদ্ধি বর্জিত স্বার্থান্বেষী পশুতুল্য মানুষগুলোর জন্যই পৃথিবীর মানুষ ভোগ করে অবর্ণনীয় দুর্দশা।

মন্তব্য : স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা অন্যতম মানবিক গুণ। বলা হয়ে থাকে, স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ। তাই প্রত্যেক মানুষের দেশপ্রেমিক আদর্শ নাগরিক হওয়া উচিত।

উত্তর ।। (২) 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'।

মূলভাব : শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষার দিকনির্দেশনা দেন। শিক্ষার্থীর সেই দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে সফল হয়ে ওঠাই হলো সুশিক্ষিত হয়ে ওঠার নামান্তর।

সম্প্রসারিত ভাব : জন্মের পর থেকেই মানুষ তার পরিবার, পরিবেশ, আত্মীয়-পরিজন থেকে শিক্ষাগ্রহণ শুরু করে এবং একটা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ করে সনদপত্র লাভ করে। কিন্তু এ স্বীকৃতি কিংবা পরীক্ষায় পাস করাই প্রকৃত শিক্ষা নয়। প্রকৃত শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়া কিংবা ভালো ফলাফল করলেই প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া যায় না। স্ব-অর্জিত শিক্ষাই মানুষকে সুশিক্ষিত করে তোলে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞান আহরণের পথকে অনেক সময় সুগম করে তুললেও এর দ্বারা জ্ঞানের পূর্ণতা আসে না। নিজ চেষ্টায় যে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করে অসাধারণ পর্যায়ে নিয়ে যায়, তার মধ্যে মৌলিকতার উন্মেষ ঘটে। এজন্য দরকার একাগ্রতা ও প্রচুর পরিশ্রম। এর ফলেই জ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করা সম্ভব। স্বীয় চেষ্টা দ্বারাই মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করে, স্বকীয়তা ও মৌলিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে সে বিচরণ করতে পারে। এভাবে মানুষ হয়ে ওঠে স্বশিক্ষিত। যোগ্যতার দ্বারাই সে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে। তাই দেখা যায়, প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মুখ্য নয়। কেননা পৃথিবীতে অনেক স্বশিক্ষিত ব্যক্তি আছে যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গন্ডি অতিক্রম করেননি। শিক্ষার মাধ্যমে আত্মার বিকাশ ঘটে। আর এ শিক্ষা অর্জনের জন্য চাই সাধনা। যিনি পরিশীলিত রুচিবোধে নম্র ও উদার তাকেই সুশিক্ষিত বলা চলে। এ সুশিক্ষা তার স্বীয় সাধনা দ্বারা অর্জিত।

মন্তব্য : সুশিক্ষিত ব্যক্তি তিনিই যার মন কুসংস্কারমুক্ত ও মুক্তবুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত। এ শ্রেণির মানুষই আলোকিত মানুষ।

■ প্রশ্ন : ঝ ॥ বাংলা প্রভাষক পদে চাকুরীর জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।

উত্তর ।।

২৫শে এপ্রিল, ২০২...

বরাবর

উপাচার্য/অধ্যক্ষ,

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিষয় : প্রভাষক পদে নিয়োগের নিমিত্ত আবেদন।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, গত ২০শে এপ্রিল, ২০২... তারিখে 'দৈনিক নয়া দিগন্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অনতিবিলম্বে একজন প্রভাষক নিয়োগ করা হবে। আমি উল্লিখিত পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে আমার জীবনবৃত্তান্তের একটি বিবরণী আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছি–

১.	নাম	:	মোহাম্মদ গোলাম জাকারিয়া
২.	পিতার নাম	:	জালাল আহমদ
৩.	মাতার নাম	:	নূর জাহান বেগম
৪.	স্থায়ী ঠিকানা	:	উত্তর আলামপুর, ডাকঘর : সিলোনীয়া বাজার, থানা : দাগনভূঁঞা, জেলা : ফেনী।
৫.	বর্তমান ঠিকানা	:	রতন কুটির, (চাঁন মিয়া মসজিদ সংলগ্ন), পুরাতন পুলিশ কোয়ার্টার, ফেনী।
৬.	জন্ম তারিখ	:	৫ই জানুয়ারি ১৯৮৫।
৭.	জাতীয়তা	:	বাংলাদেশি।
৮.	বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত।
৯.	ধর্ম	:	ইসলাম।
১০.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	

পরীক্ষার নাম	পাসের সন	ফলাফল	বিভাগ	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
দাখিল	১৯৯৯	প্রথম	সাধারণ	মাদরাসা
আলিম	২০০১	দ্বিতীয়	সাধারণ	মাদরাসা
ফাযিল (অনার্স)	২০০৫ (অনুষ্ঠিত ২০০৭)	দ্বিতীয়	আরবি	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ	২০০৬ (অনুষ্ঠিত ২০০৯)	দ্বিতীয়	আরবি	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষক নিবন্ধন	২০১১	পাস	প্রভাষক (ইসলাম শিক্ষা)	NTRCA

১১. অভিজ্ঞতা : ১/১২/২০২... খ্রি. থেকে 'ক' কলেজে, প্রভাষক (ইসলাম শিক্ষা) পদে কর্মরত আছি।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন, উপরিউক্ত তথ্যের নিরিখে ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আমার মেধা ও দক্ষতা যাচাইপূর্বক উক্ত পদে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করতে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

মোহাম্মদ জাকারিয়া

সংযুক্তি :

১. সকল পরীক্ষার সত্যায়িত সনদপত্রের অনুলিপি।
২. প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।
৩. অভিজ্ঞতার সনদপত্র।
৪. সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

■ প্রশ্ন : ঞ ॥ যৌন হয়রানি প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।

উত্তর ।।

৭ই মে, ২০২...

বরাবর

সম্পাদক,

দৈনিক সংগ্রাম,

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা।

বিষয় : চিঠিপত্র কলামে নিচের সংবাদটি প্রকাশের আবেদন।

জনাব,

আপনার সম্পাদিত ও বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ইভটিজিং প্রতিরোধকল্পে গণসচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি পাঠালাম। চিঠিটার গুরুত্ব বিবেচনা করে অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশের ব্যবস্থা করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

নিবেদক

বশির আহমদ

'ক' আলিয়া মাদরাসা, ঢাকা।

ইভটিজিং/যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা প্রয়োজন

'ইভটিজিং' বা যৌন হয়রানি একটি বহুল প্রচলিত শব্দ, যা নারীদের প্রতি এক ধরনের নির্যাতনকে বোঝায়। নারীর প্রতি এমন আচরণের মূল কারণ হচ্ছে সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। বর্তমান বিশ্বে শিশুদের ত্রুটিপূর্ণ মানসিক বিকাশ ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে তা বেড়ে উঠেছে বেপরোয়াভাবে। আর এ কারণেই পুরুষরা নারীদের হীন ও দুর্বল মনে করছে। তাছাড়া বর্তমান যুগে মোবাইল, ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের মাধ্যমে তরুণরা সহজেই অশালীন জগতের সংস্পর্শে চলে যাচ্ছে। ফলে পথে-ঘাটে চলতে নারীরা চরম নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। আর এ নিপীড়ন থেকে রেহাই পেতে নারীরা বেছে নিচ্ছে আত্মহননের পথ। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে, উত্ত্যক্তকারীরা সহিংস হয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের ওপর হামলা করে তাদের হত্যায় মেতে উঠেছে। অতীতে সিমি, মহিমা, ফাহিমার আত্মহননের জন্য দায়ীদের পার পেয়ে যাওয়াই অপরাধীদের এতটা বেপরোয়া করে তুলেছে।

ইভটিজিং প্রতিরোধে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইভটিজিং বা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। গণসচেতনতা গড়ে তুলতে গণমাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য ইভটিজিং প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, তথ্যচিত্র প্রভৃতি পুনঃপুন প্রচার করতে হবে। প্রয়োজনে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট প্রচার করতে হবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, জনসাধারণ যদি এ ব্যাপারে সর্বদা সচেতন ও সজাগ দৃষ্টি রাখে তাহলে অবশ্যই এ অবস্থার উত্তরণ সম্ভব। সর্বোপরি, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অতএব আসুন, আমরা সকলেই যৌন হয়রানি বিষয়ে সচেতন হই এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

বিনীত

বশির আহমদ

'ক' আলিয়া মাদরাসা, ঢাকা।